

আমার বাংলা বই



পঞ্চম
শ্রেণি



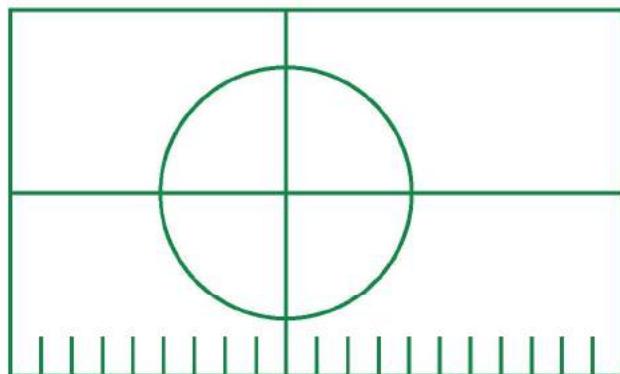
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি
ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $10 : 6$ । অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য 305 সেমি (10 ফুট) হয়, প্রস্থ 183 সেমি (6 ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের 20 ভাগের 9 ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

305 সেমি \times 183 সেমি ($10' \times 6'$)

152 সেমি \times 91 সেমি ($5' \times 3'$)

76 সেমি \times 46 সেমি ($2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

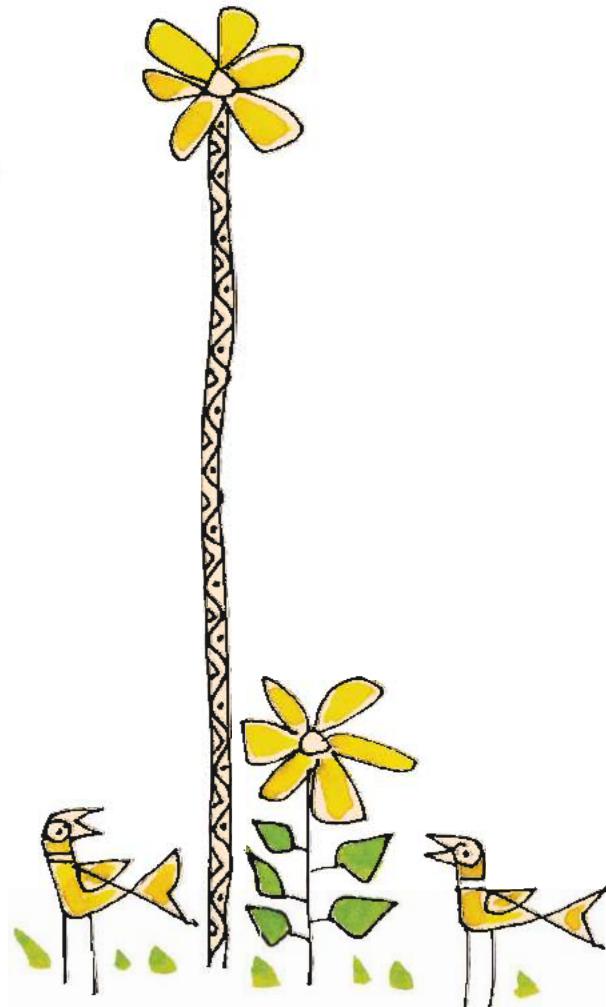
আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

হায়াৎ মামুদ
মহামুদ দানীউল হক
ড. মাসুদুজ্জামাল

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বব্রত সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিষয়। তার সেই বিশ্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষার্থীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিশ্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অস্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ হ্রান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, যেধা ও এহসন্তমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনীমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মানবীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জ্ঞানাতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচুর্ণি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সম্পূর্ণ সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ শুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

পঞ্চম শ্রেণির বালো পাঠ্যপুস্তকে ভাষা শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সম্বিশে করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কংজনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিম্বল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের তিক্ষ্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা শিখনের বিশেষ করে পড়ার ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক প্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন :

শোনা ও বলা

প্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন :

- প্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শুন্তিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রয়োজিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাবে শুনতে কলবেন;
- চিন্তার উদ্দেশ্যে করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়তাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো :

- শুন্ধ, স্পষ্ট ও প্রয়োজিত উচ্চারণে পড়া;
- শুন্ধ উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- ঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোন্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোন্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন-অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তবাঙ্গল স্পষ্ট ও শুন্ধ উচ্চারণে পড়া।

লেখা

শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় শিখতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক জুটিতে এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত নিজের ভাষায় লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা সহজে বাকে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা

ভাষা শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যগুন্তকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পঠনের জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে :

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষা-দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্মত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা সম্মত করবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে - তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানোর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন :

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুধু, সপ্ত ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে :

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিমানচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন-নদী, খাতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যগুল্মের বাইরে সময়সূচীর গত, ক্ষবিতা বলা;
- নিজের ভাষায় পঠিত বিষয়বস্তু বলা ইত্যাদি।

উল্লিখিত শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। একেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন-কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবন-ঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ডেখে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ

এবং বিশ্রেষণসহ মুক্তবর্ণের তালিকা দেয়ালে টালিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও মুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও মুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও মুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় মুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উন্নত লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্দক্ষ হলো, এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জ্ঞান শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীকে পাঠে পড়ানো হয়নি এমন শব্দও যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক প্রশংসন করবেন। লেখায় বানান সূচী করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক সুযোগ দেবেন। বানান শুধু হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশংসন করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরাম্পরার সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করবেন। ভাষা শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডগুলি যাতে বৌক্তিক হয়, শিক্ষককে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনে যাতে সহায়ক হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা-শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচলনা করবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ ধারবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জীবনস্থিতি প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমূল্য ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।



সূচিপত্র

বিষয়

| | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------|--------|
| ১. এই দেশ এই মানুষ | ১ |
| ২. সংকলন | ৬ |
| ৩. সুন্দরবনের প্রাণী | ১০ |
| ৪. হাতি আর শিয়ালের গল্প | ১৬ |
| ৫. ফুটবল খেলোয়াড় | ২২ |
| ৬. বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ | ২৬ |
| ৭. কেবুয়ারির গান | ৩১ |
| ৮. শখের মৃৎশিল্প | ৩৪ |
| ৯. শব্দদূষণ | ৪১ |
| ১০. অরণীয় ঝাঁঁরা চিরদিন | ৪৪ |
| ১১. অদেশ | ৫০ |
| ১২. কাষণমালা আর কাঁকনমালা | ৫৬ |
| ১৩. অবাক জলপান | ৬৪ |
| ১৪. ঘাসফুল | ৭৩ |
| ১৫. মাটির নিচে যে শহর | ৭৬ |
| ১৬. শিক্ষাগুরুর মর্যাদা | ৮১ |
| ১৭. ভাবুক ছেলেটি | ৮৫ |
| ১৮. দুই তীরে | ৯১ |
| ১৯. বিদায় হজ | ৯৫ |
| ২০. দেখে এলাম নায়াথা | ১০১ |
| ২১. ঝৌঝু লেখে জয় | ১০৬ |
| ২২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী | ১০৯ |
| ২৩. শহিদ তিতুমীর | ১১৫ |
| ২৪. অপেক্ষা | ১২০ |
| ● শব্দের অর্থ জেনে নিই | ১৩০ |

এই দেশ এই মানুষ

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।” কবির এ কথার অর্থ – আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। আমরা বাঙালি। বাংলাদেশের প্রায় সকল গোক বাংলায় কথা বলে। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসভার লোকজন। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তথ্বজ্ঞা ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সৌওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। সবাই যিগেমিশে আছে যুগ যুগ ধরে। এরকম খুব কম দেশেই আছে। আবার আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বাঙালি আছে।



বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত বিচ্ছিন্ন। কেউ জেলে, কেউ কুমার, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের কম্প্যুট। একজন তার কাজ দিয়ে আরেকজনকে সাহায্য করছে। গড়ে তুলছে এই দেশ।

ভাবো তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাত কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

আমাদের আছে নানা ধরনের উৎসব। মুসলমানদের রয়েছে দুটি ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আয়হা। হিন্দুদের দুর্গা পূজাসহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ। বৌদ্ধদের আছে বুদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিস্টানদের আছে ইস্টার সানডে আর বড় দিন। এছাড়াও রয়েছে নানা উৎসব। পহেলা বৈশাখ- নববর্ষের উৎসব। রয়েছে রাখাইনদের সাথাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।



পহেলা বৈশাখের উৎসব



পার্বত্য জেলার সরবাড়ি

পোশাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ভিন্ন ধীচের। মিল আমাদের একটা জায়গায়-
সকলেই আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন তাই ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা
দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের বেশাভূমি। এজন্য দেশের নানা
প্রান্ত যেমন ঘুরে দেখা দরকার তেমনি দরকার আজীয়- জৰুরি ও বস্তুদের বাড়ি বেড়াতে
যাওয়া, পরস্পর মেলামেশা করা। কাছাকাছি আসা, মানুষকে ভালোবাসা।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র— এইসব। দেশ হলো জননীর মতো।
জননী যেমন দ্রেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনই তার আগো,
বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এদেশকে আমরা ভালোবাসব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সৌভাগ্য প্রকৃতি বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর স্বজন সার্থক সাহাই বিজু

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রকৃতি সৌভাগ্য বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর সার্থক

ক. আমাদের যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

খ. আমাদের দেশে রয়েছে সুন্দর।

গ. কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের।

ঘ. একই দেশ অথচ কত।

ঙ. দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, , পাহাড়, সমুদ্র- এইসব।

চ. দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?

গ. বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?

ঘ. “দেশ হলো জননীর মতো।” দেশকে জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

ঙ. জেলেদের পেশা কী? তারা যদি কাজ না করে তাহলে আমাদের কী হতে পারে?

চ. “ধর্ম যার যার উৎসব যেন সবার।” – এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ছ. দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে তিটি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র- এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। মা যেমন আমাদের দ্রুহমতা, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন, দেশও তেমনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ দেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-------|-----|-------|----------|----------|
| বাঞ্ছালি | অবাঞ্ছালি | ক্ষম্ভু | শত্রু | দেশ | বিদেশ | সার্থকতা | ব্যর্থতা |
|----------|-----------|---------|-------|-----|-------|----------|----------|

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক আছে।

খ. আমরা সবাই পরস্পরের.....।

গ. হলো জননীর মতো।

ঘ. আমাদের যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

৬. নিচের বাক্য কয়টি পড়ি।

মনির খুব ভালো ছেলে। রবিন তার ক্ষম্ভু। মনির ও রবিন একত্রে মাঠে খেলে।

| | | |
|--------|------------|--------------|
| এখানে, | মনির, রবিন | - বিশেষ্য পদ |
| | খুব ভালো | - বিশেষণ পদ |
| | তার | - সর্বনাম পদ |
| | ও | - অব্যয় পদ |
| | খেলে | - ক্রিয়া পদ |

এবার নিচের বাক্য কয়টি থেকে ৫ ধরনের পদ খুজে বের করি।

“বাংলাদেশের জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আত্মায়-স্বজন ও ক্ষম্ভুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। উচিত সবার সবাইকে ভালোবাসা।”

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

খ. শিক্ষকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (৩ দিন/৪ দিন পরপর)

টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিতে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

| তারিখ | আনন্দের সংবাদ | দুঃখের সংবাদ | খেলার সংবাদ |
|-------|---------------|--------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে
 দেখব এবার জগৎকাকে,-
 কেমন করে যুরছে মানুষ
 যুগান্তের ঘূর্ণিপাকে।
 দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
 ছুটছে তারা কেমন করে,
 কিসের নেশায় কেমন করে
 মরছে যে বীর লাখে লাখে,
 কিসের আশায় করছে তারা
 বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে॥

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
 চন্দ্রপোকের অচিন্পুরে;
 শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্
 মজাল হতে আসছে উড়ে॥
 পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
 উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
 বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
 আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥

(সংক্ষেপিত)



অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদ্য কৌতুহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অভরীক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—সে বন্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংকল্প বন্ধ যুগান্তর দেশান্তর বরণ মরণ-যন্ত্রণা দুঃসাহসী চন্দ্রলোক
আচিনপুর ফেড়ে



৩. একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

| | | | |
|----------|---|-----------|--|
| সংকলন | - | প্রতিজ্ঞা | ভালো কাজের জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত। |
| বন্ধ | - | বন্ধ | ইঙ্গিত |
| দেশান্তর | - | অন্যদেশ | বরণ |
| জগৎ | - | পৃথিবী | সাদরে গ্রহণ |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও শিখি।

- ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?
- খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘূরছে বলতে কী বোঝা লেখ?
- গ. চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?
- ঘ. কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?
- ঙ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

| চলিত রূপ | সাধু রূপ | চলিত রূপ | সাধু রূপ |
|----------|----------|----------|----------|
| আঁকিব | আঁকিব | ছুটছে | ছুটিতেছে |
| দেখিব | দেখিব | আসছে | আসিতেছে |
| ঘূরছে | ঘূরিতেছে | চলছে | চলিতেছে |
| মরছে | মরিতেছে | | |

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

- ক. আমি কাজটি করি।
আমি কাজটি করেছিলাম।
আমি কাজটি করব।

উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত করি, করেছিলাম ও করব – এগুলো ‘করা’ ক্রিয়াপদটির বিভিন্নরূপ।
যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বোঝানো হয়েছে।
যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

- খ. নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিই।
আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।
আমি আমার দক্ষতা অন্যের উপকারে ব্যবহার করি।

কিশোর বর্ষাকালে তার গ্রামে গাছ লাগাবে।

তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

(গ) নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে পূর্ণাত্মক করি

থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘূরব, পড়ব, খেলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব

ভবিষ্যৎ

বর্তমান

অতীত

থাকব

থাকি

থেকেছিলাম

৭. শব্দগুলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (র-এর পরে ‘ণ’ বসে), বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, বিশ্বজগৎ, ইঙ্গিত।

৮. কবির সংকলনগুলো লিখি।

৯. আমার সংকলনগুলো লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি।

কবি- পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ,(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

তাঁর কবিতা, গান, গঞ্জ, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন। ‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিষের বৌশি’, ‘ঝিঙে ফুল’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কাজী নজরুল
ইসলাম



সুন্দরবনের প্রাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্মান সুন্দরবন। সমুদ্রের কোল হৈষে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজগত।



রয়েল বেঙ্গল টাইগার

বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন, ক্যাঞ্চারু বললেই মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার কথা। সিংহ বললেই মনে ভেসে ওঠে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের নাম। এই বাঘ থাকে সুন্দরবনে। এ বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আবার ভয়ঙ্কর। এর চালচলনও রাজাৰ মতো। সুন্দরবনের ভেজা স্যাতসেঁতে গোলপাতার বনে এ বাঘ ঘূরে বেড়ায়।

শিকার করে জীবজন্ম, সুযোগ পেলে মানুষও যায়। এক সময় সুন্দরবনে ছিল চিতাবাঘ ও খুলবাঘ। কিন্তু এখন আর এসব বাঘ দেখা যায় না। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গাল টাইগার বাংলাদেশের অমৃত্যু সম্পদ। এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিৎ, কোনোটার গায়ে ফেঁটা ফেঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিরা হরিণ। এক সময় সুন্দরবনে প্রচুর গন্ধার ছিল, ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গালে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্ম, পশুপাখি এক অমৃত্যু সম্পদ। দেশের জলবায় আবহাওয়া গাছপালা বৃক্ষলতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলেই সে দেশের প্রাণিকূল জীবনধারণ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। শকুন দেখতে যে খুব সুন্দর পাখি তা কিন্তু নয়। এরা উড়ে বেড়ায় আকাশের অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খায় এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু শকুন এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয়—বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি।



চিরা হরিণ



গরুর



হাতি



শঙ্খ



মদন টাক



হুনো শুয়োর

পশুপাখি ও জীবজন্মু প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। প্রকৃতিতে যদি বিপর্যয় ঘটে তবে এদের জীবনও বিপন্ন হয়। সুন্দরবনের অনেক প্রাণী প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেসব প্রাণী আছে তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অপার সম্ভার রয়েল তয়ঙ্কর অমৃল্য বিলুপ্তপ্রায়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমৃল্য অপার সম্ভার রয়েল তয়ঙ্কর বিলুপ্ত

ক. বাংলাদেশ সৌন্দর্যে ভরপুর।

খ. প্রকৃতির অপার সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেঙ্গল টাইগার।

ঘ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার।

ঙ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের সম্মদ।

চ. শকুন বাংলাদেশে এখন পাখি।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

| | |
|--------------|---|
| অস্ট্রেলিয়া | এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ। |
| ক্যাঙ্গারু | একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু-পা বড় আর সামনের দু-পা ছোট। এর ফলে অন্যান্য চতুর্ষিদ্বারা প্রাণীর মতো এরা হাঁটাচলা করতে পারে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারু তার বুকের নিচে একটা থলিতে বাঢ়া রাখে। |
| চিতাবাঘ | এক প্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য। চিতাবাঘ অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে ও গাছে উঠতে পারে। |
| গঙ্গার | কালো ও ধূসর রঙের চতুর্ষিদ্বারা প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. ক্যাঞ্জারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?
- খ. বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
- গ. দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।
- ঘ. শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?
- ঙ. পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই এক-একটি পদ :

| | |
|---------------|------------|
| শকুন | বিশেষ্য পদ |
| ক্ষতিকর | বিশেষণ পদ |
| সে | সর্বনাম পদ |
| খায় | ক্রিয়া পদ |
| ছাড়া | অব্যয় পদ |

পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

নিচের বাক্যগুলোতে কী কী পদ আছে তা লেখ।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

৬. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাঙাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

- ক. আকৃতি -
- ঘ. আবাসস্থল -
- খ. রং -
- ঙ. খাদ্যাভ্যাস -
- গ. কোথায় দেখা যায় -

৭. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ক্যাঞ্জারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা-

- | | |
|-----------------|-------------|
| ১. ভারত | ২. বাংলাদেশ |
| ৩. অস্ট্রেলিয়া | ৪. আফ্রিকা |

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?

- | | |
|----------|---------|
| ১. সিঙ্গ | ২. হাতি |
| ৩. বাঘ | ৪. উট |

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ১. সিলেট ও খুলনার | ২. ভাওয়াল ও মধুপুরের |
| ৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের | ৪. উপরের সবখানে |

ঘ. কোন পাথি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিছন্ন রাখে?

- | | |
|--------|---------|
| ১. ইগল | ২. শকুন |
| ৩. চিল | ৪. কাক |

ঙ. কোন প্রাণীর গায়ে ফেঁটা ফেঁটা সাদা দাগ ও বড় শিং আছে?

- | | |
|-------------|--------------|
| ১. চিতা বাঘ | ২. চিরা হরিণ |
| ৩. ভালুক | ৪. গভার |

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি- যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।
পরে শ্রেণির স্বার সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

হাতি আৰ শিয়ালেৱ গল্প

সে অনেক-অনেক দিন আগোৱ কথা। চারদিকে তখন কী সুন্দৰ সবুজ বন, ঝোপবাড়। আৱ
দিগন্তে ঝুকে পড়া নীল আকাশেৱ ছোঁয়া। এৱেকম দিনগুলোতে মানুষেৱা থাকত লোকালয়ে আৱ
পশুৱা জৰালৈ।

মানুষ তখন একটু একটু কৱে সভ্য হচ্ছে। কী কৱে সবাৱ সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে
সেইসব কায়দাকানুন। শ-দিকে বনে বনে তখন পশুদেৱ রাজত্ব। হাজাৱ রকমেৱ প্ৰাণী, অসংখ্য
পাখ-পাখালি। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনেৱ পাখি আৱ প্ৰাণীদেৱ দিনগুলো। কিন্তু একদিন হলো
কি তাড়া খেয়ে মন্ত একটা হাতি এই বনে ঢুকে পড়ল। হাতিটাৱ সে-কী বিশাল শৱীৱ। পাগুলো
বটপাকুড় গাছেৱ মতো মোটা। শুড় এতটাই লম্বা যে আকাশেৱ গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তাৱ
গায়েও অসীম জোৱ। এই শৱীৱ আৱ শক্তি নিয়েই তাৱ যত
অহংকাৱ। মেজাজটাও দারুণ তিৱিক্ষি।



তো-যেই-না হাতিটার এই বনে ঢোকা, অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। নতুন অতিথি এসেছে, সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এই দুষ্টু হাতিটার সে-কী তুলকালাম কাও! খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুজ্জার। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন। গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি, তারা ভয়ে ডানা বাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় শুকিয়ে ছিল যে ইদুর, গুব্রে পোকার দল। তারা বুবাতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী?

হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করল, সেই বুঝি বনের রাজা। গুরুগঙ্গীর ভারিকি চালের কেশের দোলানো অমিত শক্তিধর সিংহ। সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায়। হালুম বাঘ মামা, সেও হাতিটার ধারে-কাছে দেঁষতে চায় না। বনের সবাই ভয়ে তটস্থ, শক্তিকৃত। কখন জানি কী হয়!

একবার তো কী জানি কী হয়েছে। নিরীহ একটা হরিণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আরেকবার ছেউ একটা পিপড়ে পায়ের তলায় পিয়ে মেরে ফেলল। সেই থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়াও মাড়াত না। দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও অহংকারী। এই নিয়ে বনের কারো মনে শাস্তি নেই।

কিন্তু এভাবে কি দিন যায়? এক সম্মিয়ায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো সিংহের গুহায়। এর একটা বিহিত চাই, সবার মুখে এক কথা। বাঘ, ভাঙুক, সিংহ, বানর, হরিণ, বনবিড়ল, শিয়াল সবাই সলা-পরামর্শ করতে বসল। শেষে সবাই মিলে শিয়ালের উপরেই ভার দিল।

দিন আসে, দিন যায়। একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ওই দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।

হাতি তো শিয়ালের কথা শুনে মহা খুশি। আচ্ছা চল। নদীর পারে এসে শিয়াল বলল, এই আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আসুন। এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাপ। হাতি ভাবল, পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল।

কিন্তু মন্ত বড় তার শরীর আর কী ভারী! হাতিটা নদীর পানিতে পা দিল। অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল, শিয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও। শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে। বনের সমস্ত প্রাণী তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

শিয়াল হাতিকে বলল, তোমাকে বাঁচাব আমরা? এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে
শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। তোমাকে শান্তি দেওয়ার জন্যেই তো নদীতে নিয়ে এসেছি। বনের
যত প্রাণী ছিল, সবাই শিয়ালের কথার প্রতিধ্বনি করে সমন্বয়ে বলে উঠল :

ঠিক বলেছ শিয়াল ভায়া
আর দেখব না হাতির ছায়া
আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন
নাচছি সবাই তা-ধিন তা-ধিন।

(হিতোপদেশ অবলম্বনে)



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগন্ত অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শক্তিত
শক্তিধর আস্তানা উদগ্রীব সমষ্টিরে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শক্তিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

খ. পতনের মূল।

গ. কী হয়েছে, এত হয়ে আছ কেন?

ঘ. বনের সিংহ দিলে মানুষের মনে ভয় জাপে।

ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে বাঁধিয়ে দিয়েছে।

চ. ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

ছ. মেজাজ বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

জ. তুমি এত কেন? কী হয়েছে?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?

খ. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?

গ. গঞ্জে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ঘ. শিয়াল হাতিকে শান্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।

ঙ. হাতির এই শান্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর।

চ. মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?

ছ. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?

জ. শিয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?

ঝ. অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর

কৃৎসিত

অহংকার

নিরহংকার

ভয়

সাহস

স্বাধীন

পরাধীন

ক. আমরা দেশের অধিবাসী।

খ. পতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল হলো মানুষের মন।

ঘ. মনে থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

৫. ঠিক উভরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ে হলো?

- | | |
|---------|-----------|
| ১. বাঘ | ২. শিয়াল |
| ৩. হাতি | ৪. সিংহ |

খ. কার জন্য বনে আবার শান্তি এলো?

- | | |
|----------|-----------|
| ১. সিংহ | ২. শিয়াল |
| ৩. ভালুক | ৪. বাঘ |



গ. হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শিয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ১. শিয়াল সাঁতার জানে | ২. শিয়াল খুব সাহসী |
| ৩. শিয়াল বুদ্ধিমান | ৪. শিয়াল হাতির বন্ধু |

ঘ. হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ১. হাতির অহংকার | ২. হাতির লম্বা শুঁড় |
| ৩. হাতির ভারী শরীর | ৪. হাতির বোকামি |

ঙ. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ১. হাতির অত্যাচারের জন্য | ২. হাতি খুব বড় বলে |
| ৩. হাতির ভয়ে | ৪. হাতি সাঁতার জানে বলে |

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

| | | |
|-----------|---------|---|
| শান্তি | অশান্তি | অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে। |
| সভ্য | | |
| ধৰনি | | |
| শক্তিশালী | | |

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

| | | |
|-----------|---|--------|
| দুর্কু | - | বিশেষণ |
| হাতি | - | |
| বৃদ্ধিমান | - | |
| এবং | - | |
| আমি | - | |
| চায় | - | |

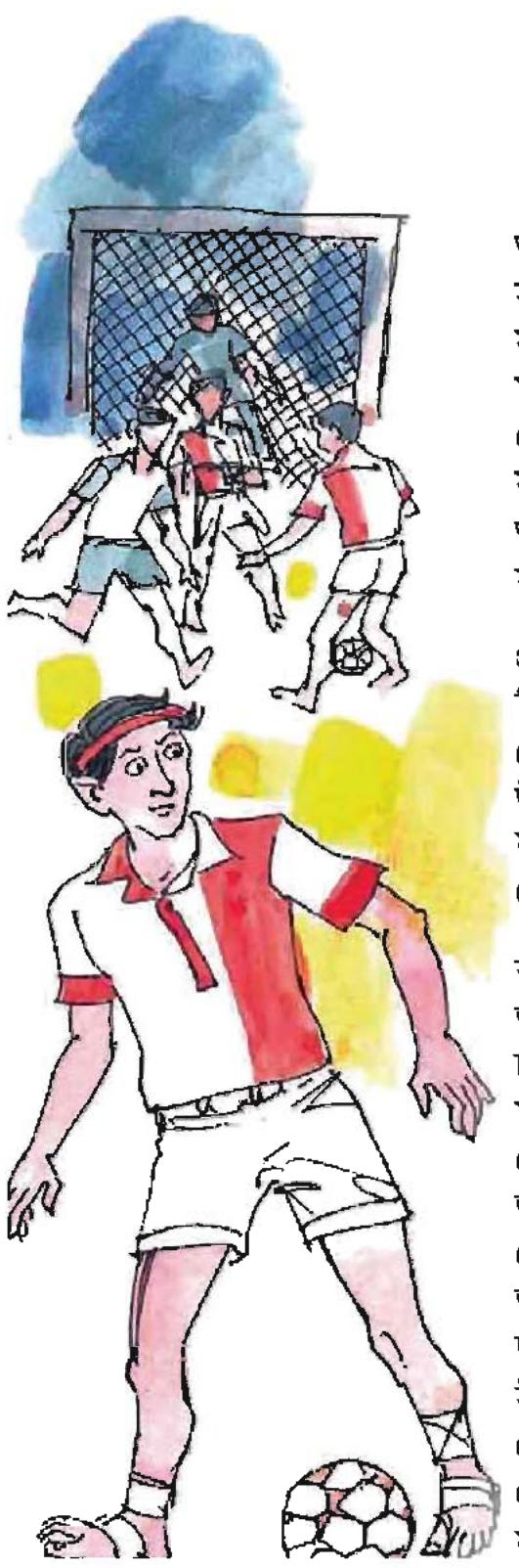
৮. যেকোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পীচটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিক্ষকের সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নেটুবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রতিটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক খেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

ফুটবল খেলোয়াড়

জসীম উদ্দীন



আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়,
হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
সন্ধ্যাবেলায় দেখিবে তাহারে পাটি বাঁধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাথিছে প্রতি গিটে গিটে কাত হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেই দিতে ভাঙ্গা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেন্দে কেন্দে ডাক ছাড়ে।
আমরা তো ভাবি ছ মাসের তরে পঙ্গু সে হলো হায়,
ফুটবল-চিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেলায় খবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙ্গা খাটিয়ার পরে।
টেবিলের পরে ছেট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।
সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিঅয়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে।

বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে টেলা,
ভাঙ্গা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্জ করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের আগে ধাও,
মারো জোরে মারো-গোলের ভিতরে বলেরে ছুড়িয়া দাও।
গোল-গোল-গোল, চারদিক হতে শুঠে কোলাহলকল,
জীবনের পণ, মরণের পণ, সব বাধা পায়ে দল।
গোল-গোল-গোল—মোদের মেসের ইমদাদ হক কাঞ্জি,
ভাঙ্গা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি�।
দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে মহা-কলরব করে,
ইমদাদ হক ঝৌড়াতে ঝৌড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।
মেসের চাকর হয়রান হয় পারেতে মালিশ মাথি,
বেঘুম রাত্রি কেটে যায় তার চিংকার করি ডাকি।
সকালে সকালে দৈনিক খুলি মহা-কলরবে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা-পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। তার জন্যই সকল দর্শক খেলার আনন্দ পায়। এই কবিতায় খেলাছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যোগ্যতার সবচুক্তি দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ক্ষত পটি মালিশ ড্রিবলিং বজ্র কোলাহলকল মহাকলরব

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বঞ্চি পটি মালিশের ক্ষত মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের রয়েছে।

খ. সম্ম্যাবেলায় পায়ে হাতে বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের ওপর শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?

খ. টেবিলের ওপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

গ. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা দাও।

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক শাইনটি লিখি।

ক.,

সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে ছেট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,

..... |

গ. গোল—গোল—গোল— মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

..... |

৬. ইমদাদ হক সম্রক্ষে পাচটি বাক্য লিখি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম—অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় খেলা নিয়ে একটি রচনা লিখি।

খ. ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা
আবেদনপত্র লিখি।

গ. নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্লীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম :

২. বিদ্যালয়ের নাম :

৩. শ্রেণি :

৪. (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম:

(খ) শিক্ষার্থীর মাতার নাম:

৫. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ডাকঘর/মহল্লা

উপজেলা জেলা ঢাক্কা

৬. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ডাকঘর/মহল্লা

উপজেলা জেলা.....

৭. জন্ম তারিখ

৮. যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

ক.

খ.

গ.

শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর



জসীম উদ্দীন

কবি-পরিচিতি

কবি জসীম উদ্দীন ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি ‘পল্লিকবি’ নামে খ্যাত হয়েছেন। তবে জসীম উদ্দীন ছোটদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা ‘কবর’, কাব্যগ্রন্থ ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ ও ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ছোটদের জন্য লেখা ‘ডালিম কুমার’, ‘হাসু’ ও ‘এক পয়সার বাঁশি’ বিখ্যাত। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

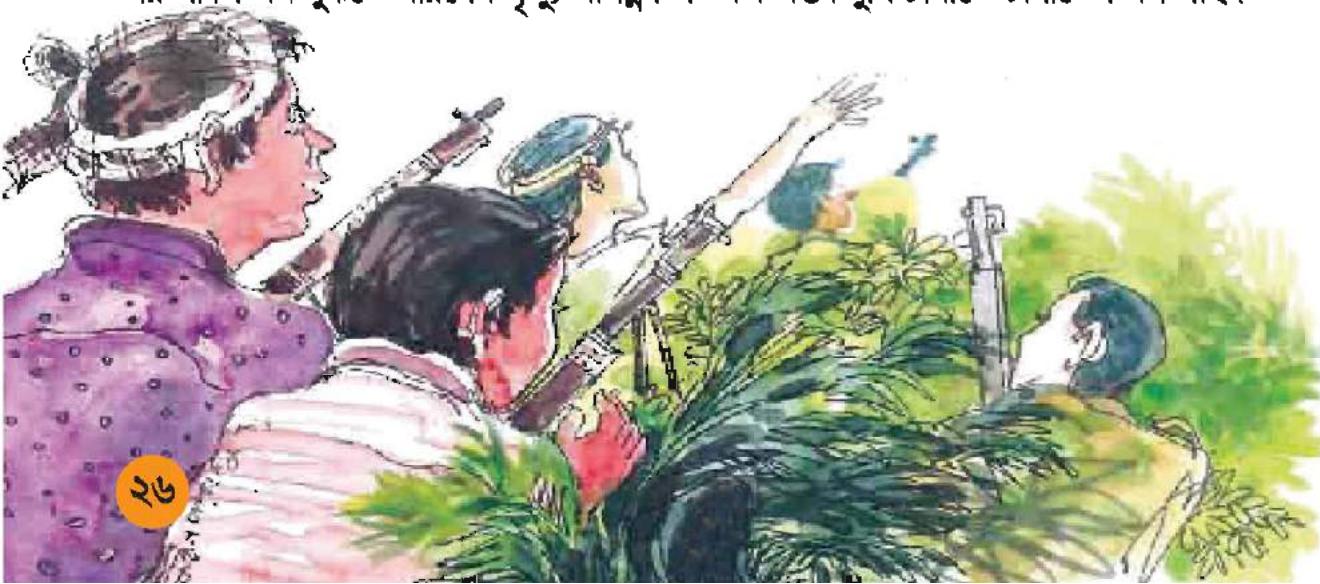
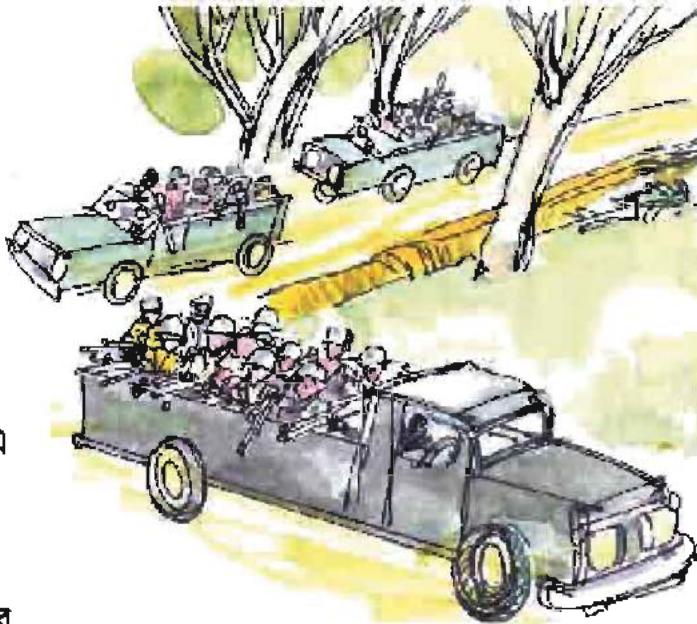
বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

দুরত্ব এক কিশোর। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ।
বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার
আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ। কিশোর
বয়সে হঠাতে করে তার বাবা-মা মারা গেলেন।
বদলে গেল তাঁর জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর-এ
অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ।

সময়টা ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর।

যশোরের পাকিস্তানি ছুটিপুর ক্যাম্প। একটু দূরে
গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দিছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা। এন্দেরই নেতৃত্বে
ছিলেন ল্যাঙ্কনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সেনারা টের পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের
অবস্থান। রাজাকারদের সহায়তায় তিনি দিক থেকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘিরে ফেলে।
কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দমবার পাত্র নন। এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নানু মিয়া।
কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাতে এসে লাগে তাঁর গায়ে। নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে
কাঁধে তুলে নিলেন আর অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন। কৌশল হিসেবে বারবার নিজের
অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি। উদ্দেশ্য-একজন নন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ
করছেন, শত্রুদের এ রকম একটা ধারণা দেওয়া। সংখ্যায় কম বলে সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন
পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

কিন্তু হঠাতে মর্টারের একটা গোলা এসে লাগল তাঁর পায়ে। গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল
তাঁর পা। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ



হলেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে নূর মোহাম্মদ শেখ
এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।
সাহসী এই বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার জন্ম ১৯৩৬ সালের
২৬শে ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে।

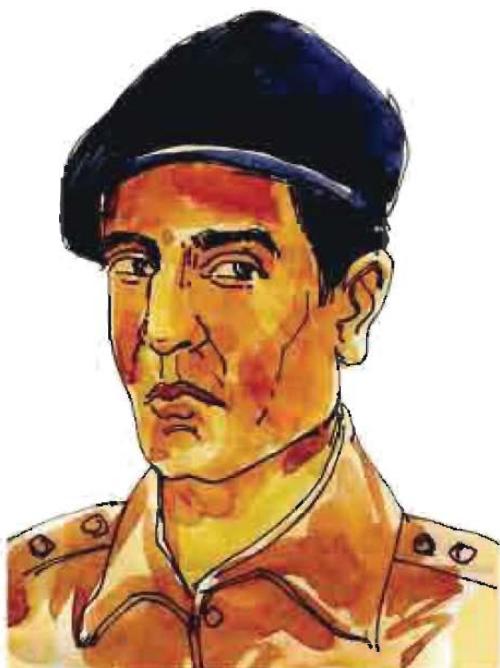
এ রকমই আরেক যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ ল্যাঙ্গনায়েক মুসী আবদুর
রউফ। ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী
থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায়
দারুণ দুরস্ত ছিলেন। তিনিও ইপিআর বাহিনীতে যোগ
দেন। মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি
সৈনিকদের মতো মুক্তিযুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েন।



বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

দিনটি ছিল একান্তরের ৮ই এপ্রিল। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের উপর আক্রমণ
করবে। এজন্যে তাঁরা মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিথড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ
করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সাথে নিয়ে আসে
সাতটি স্পিডবোট আর দুটি মোটর লঞ্চ। স্বল্পসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু ছিল অবধারিত। তবু

মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে যান নি। আবদুর রউফ নিজেই
দায়িত্ব নিলেন নিজের জীবন দিয়ে সবাইকে রক্ষা
করার। হালকা একটা মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে
গুলি ছুঁড়ে শত্রুদের রুখে দিতে থাকলেন। সহযোদ্ধাদের
বললেন নিরাপদে সরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের
আক্রমণে পাকিস্তানিদের সাতটি স্পিডবোটই ভুবে
গেল। বাকি লঞ্চ দুটো থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা
পিছু হটতে থাকল। এ রকম মুহূর্তেই হঠাৎ একটা গোলা
এসে পড়ল তাঁর উপর, তিনি শহিদ হলেন। বীরের
রক্তস্তোত্রে রঞ্জিত হলো মাটি। রাঙামাটি জেলার বোর্ড
বাজারের কাছে নানিয়ারচরের চিথড়ি খালের কাছাকাছি
একটি টিলার উপর সমাহিত হন বীরশ্রেষ্ঠ মুসী আবদুর
রউফ। পরবর্তী সময়ে সমাধিকে স্থান্তরিত
করে সরকার।



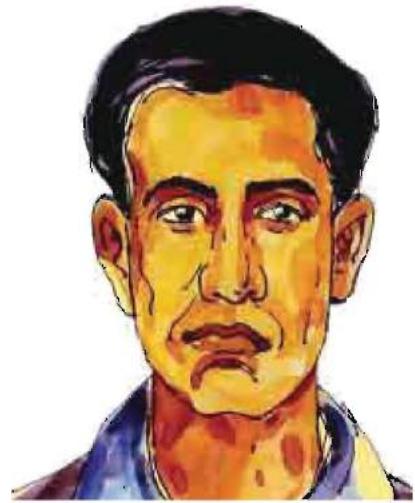
বীরশ্রেষ্ঠ মুসী আবদুর রউফ

একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কতভাবেই না যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমাদের। এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম গৌরব। এ রকমই এক যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ বুহুল আমিন।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে আমরা। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস পদ্মা মঙ্গা বন্দর দখল করে নিয়েছে। এবার খুলনা দখলই লক্ষ্য। তৈরব নদী বেয়ে খুলনার দিকে ধেয়ে আসছেন তাঁরা।

জাহাজ দুটি খুলনার কাছাকাছি চলে আসে। এমন সময় একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা এসে পড়ে। বুহুল আমিন বিএনএস পলাশের ইঞ্জিনরুমে ছিলেন। ইঞ্জিনরুমের ওপরে বোমা পড়েছিল। ইঞ্জিন বিকল হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল পলাশে। তাঁর ডান হাতটি উড়ে গিয়েছিল। তিনি আহত অবস্থায় ঝাপ দিয়ে নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি শহিদ হলেন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গবর্ত আমরা।



বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ বুহুল আমিন

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল আসন্ন অবধারিত রক্তস্তোতে রঞ্জিত শায়িত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ

নানু মিয়া

শিপইয়ার্ডের

১৯৪৩ চই মে

বুহুল আমিন

ক. ল্যাঙ্কনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী

মুক্তিযোদ্ধা।

খ. নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সেদিন এভাবেই রক্ষা
করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।

গ. ল্যাঙ্গনায়েক মুক্তি আবদুর রউফ সালের মে ফরিদপুর
জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘ. খুলনা কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ
..... ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে
ছিলেন?

খ. ল্যাঙ্গনায়েক মুক্তি আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।

গ. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?

ঘ. গল্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

৪. ব্যাখ্যা করি।

দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

| | | |
|--------|-------|-----------------------------------|
| দুরস্ত | শান্ত | শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে। |
| অসীম | | |
| সুনাম | | |
| বীর | | |
| জয় | | |
| জীবন | | |

৬. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) টিক দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন ?

১. বাংলাদেশ রাইফেলসে ২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
৩. বাংলাদেশ নেতৃত্বে ৪. কোনোটিই না

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ এর জন্ম-

১. ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২. ১৯৩৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি
৩. ১৯৩৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি ৪. ১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ঢুবে গিয়েছিল ?

১. পাঁচটি ২. আটটি
৩. সাতটি ৪. নয়টি

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মুল্লী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়-

১. বোয়ালমারির সালামতপুর ২. বঙ্গিবাজার
৩. নানিয়ারচরের চিথড়িখাল ৪. বুড়িঘাট

ঙ. খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা-

১. নূর মোহাম্মদ শেখ ২. মুল্লী আবদুর রউফ
৩. মোস্তফা কামাল ৪. মোহাম্মদ বুহুল আমিন

৭. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি ।

ক. শহিদ দিবস-

খ. স্বাধীনতা দিবস-

গ. বাংলা নববর্ষ-

ঘ. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-

ঙ. বিজয় দিবস-





ଫେବ୍ରୁଆରିର ଗାନ

ଶୁଭକୁର ରହମାନ ରିଟନ

ଦୋଯେଲ କୋଯେଲ ମୟନା କୋକିଳ
ସବାର ଆଛେ ଗାନ
ପାଖିର ଗାନେ ପାଖିର ସୁରେ
ମୁଖ ସବାର ପ୍ରାଣ ।

ସାଗର ନଦୀର ଉର୍ମିମାଳାର
ମନ ଭୋଲାନୋ ସୁର
ନଦୀ ହଞ୍ଚେ ଦ୍ରୋତର୍ବିନୀ
ସାଗର ସମୁଦ୍ର ।

ଛଡ଼ାଯ ପାହାଡୁ ସୁରେର ବାହାର
ବରନା-ପ୍ରକୃତିତେ
ବାତାସେ ତାର ପ୍ରତିଧବନି
ଶ୍ରୀମ୍ଭ-ବର୍ଷା-ଶୀତେ ।



ଗାଛେର ଗାନେ ମୁଗ୍ଧ ପାତା
ମୁଗ୍ଧ ଝର୍ଣ୍ଣତା
ଛନ୍ଦ-ସୁରେ ଫୁଲେର ସାଥେ
ପ୍ରଜାପତିର କଥା ।

ଫୁଲ ପାଖି ନଇ, ନଇକେ ପାହାଡୁ
ବରନା ସାଗର ନଇ
ମାୟେର ମୁଖେର ମଧୁର ଭାଷାଯ
ମନେର କଥା କଇ ।

ବାହ୍ଲା ଆମାର ମାୟେର ଭାଷା
ଶହିଦ ଛେଲେର ଦାନ
ଆମାର ଭାଇୟେର ରଙ୍ଗେ ଲେଖା
ଫେବ୍ରୁଆରିର ଗାନ ।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি অরণ্যীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেকে (যাদের নাম জানা যায় নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফুর রহমান রিটন ‘ফেব্রুয়ারির গান’ কবিতাটি লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শুন্দী প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মুগ্ধ উর্মি উর্মিমালা স্নোতম্বিনী সমুদ্রুর বাহার স্বর্ণলতা প্রতিধ্বনি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সমুদ্রুর মুগ্ধ বাহার প্রতিধ্বনি মন ভোলানো স্নোতম্বিনীতে

ক. বাংলার সৌন্দর্য দেখে আমি।

খ. গ্রীষ্মকালে ফলের দেখা যায়।

গ. সাত তের নদী পার হওয়া চাঢ়িখানি ব্যাপার না।

ঘ. ভেসে চলেছে পাল তোলা নৌকা।

ঙ. রংধনুর রং এ আকাশ রঙিন হয়েছে।

চ. সকল মানুষের কঢ়ে একই।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?

খ. পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?

গ. প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?

ঘ. আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?

ঙ. ‘শহিদ ছেলের দান’ হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?



৫. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মনের বস্থা কীভাবে বলব?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ১. মায়ের ভাষায় | ২. বাবার ভাষায় |
| ৩. দাদার ভাষায় | ৪. মামার ভাষায় |

খ. পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?

- | | |
|-----------|---------|
| ১. বিরক্ত | ২. মৃগ |
| ৩. রাগ | ৪. খুশি |

গ. নদীর অপর নাম কী?

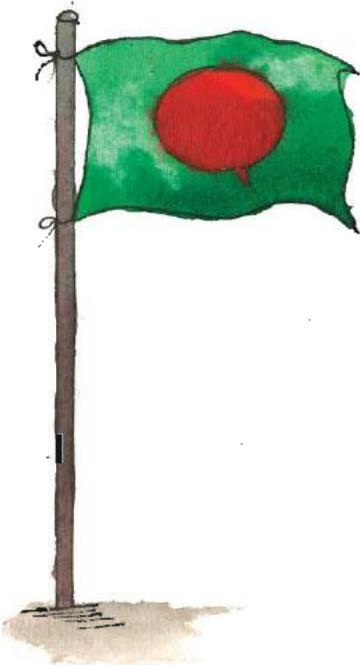
- | | |
|------------------|----------|
| ১. স্ন্যোতস্বিনী | ২. পুকুর |
| ৩. সমুদ্র | ৪. খাল |

ঘ. ফুলের সাথে কে কথা বলে?

- | | |
|-------------|---------|
| ১. প্রজাপতি | ২. হরিণ |
| ৩. মানুষ | ৪. পাখি |

ঙ. ফেন্স্যারির গান কাদের রক্তে লেখা?

- | | |
|------------|------------|
| ১. ভাইয়ের | ২. মামার |
| ৩. বাবার | ৪. মানুষের |



৬. কর্ম-অনুশীলন

একুশে ফেন্স্যারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।



মুফত রহমান

রিটন

কবি-পরিচিতি

মুফত রহমান রিটন ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিচ্চির বিষয়ে ছড়া ও কবিতা রচনা করে তরুণ বয়সেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছড়া ছাড়াও তিনি গল্প উপন্যাস লেখেন। এরই সীকৃতিস্বরূপ ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ : ‘ধূম্রলি’, ‘ঢাকা আমার ঢাকা’, ‘ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ’, ‘ভূতের বিয়ের নিমজ্জনে’, ‘বাচ্চা হাতির কান্দকারখানা’ ইত্যাদি।

শখের মৃৎশিল্প

গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে, মামার বাড়ি রসের ইঁড়ি। আসলেই তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও। এই তো মামার বাড়ি। গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখে মেলা বসে। মামা বলপেন, তোমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাব।



শখের ইঁড়ি

আমরা ছিলাম চারজন— আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা আর ছোট ভাই তাজিন। মেলা বসে সকালে। আমরা একটু দেরি করেই গেলাম। মামা বেশ মজার মানুষ। কাঁধে বোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে ছবি আঁকার জিনিস, থাকে একটা বাঁশি। পড়েন ঢাকার চারুকলা ইনসিটিউটে। মেলার একটু কাছে পৌছতেই শুনতে পেলাম নাগরদোলার ক্যাচর ক্যাচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই, খালুই। আরও কত কী! বসেছে বাঞ্ছি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়িকি, জিলাপি আর বাতাসার দোকান সারি সারি। আরেকটু এগোতেই দেখতে পেলাম কত রঞ্জের, কত বর্ণের বিচ্চি সব মাটির ইঁড়ি। ফুল, পাতা, মাছের ছবি আঁকা সেসবে। রয়েছে মাটির ঘোড়া, হাতি, শাঁড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব সুন্দর মাটির ইঁড়ির দিকে। মামাকে জিজেস করলাম-এটা কিসের ইঁড়ি?

মামা বললেন, এটা শখের ইঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর ইঁড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের ইঁড়ি। তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই তো সুন্দর।

আমরা দুটি শখের ইঁড়ি কিনলাম। অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রূপালি ইলিশ। পন্থার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট। আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম। মামা বললেন, ওই যে পুতুলগুলো দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয়। যেমন— বউ জামাই, কৃষক, নথপরা ছেউ মেয়ে-নানা রকমের মাটির টেপা পুতুল। মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দোকান। মামা বললেন, এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা। মামা বুঝিয়ে বললেন— যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস। যেমন— কলস, ইঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ইঁচ। আরও কত কী!

মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো। দোঁআশ মাটি তেমন আঠালো নয়। আর বেলে মাটি তো ঝরবরে— তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তারা বৎশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছে।



টেপা পুতুল



টেপা পুতুল



কাঠের চাকায় মাটির পাত্র তৈরি হচ্ছে

আবার এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। সবকিছুর আগে যেটা দরকার তা হলো একটা কাঠের চাকা। এই চাকায় নরম মাটির তাল লাগিয়ে নেন কুমাররা। তারপর চাকাটি জোরে ঘোরান। আর হাত দিয়ে মাটির তাল ধরেন। এভাবে নানা আকারের মাটির পাত্র ও নানা জিনিস তৈরি করেন কুমাররা।

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ছোট কলস কিনলাম। মামা বললেন, এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ- এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি। নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন। আর রং তৈরি করেন শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে। তবে আজকাল বাজার থেকে কেনা রংও লাগানো হয়। মেলা থেকে কদমা, বাতাসা, মুড়কি ও খৈ কিনে শখের ইঁড়ি ভর্তি করে আমরা ফিরলাম। খুব মজা হলো।

মামা বললেন, তোমাদের কাল কুমারপাড়ায় নিয়ে যাব। পরদিন আমরা দেখতে গেলাম কুমারপাড়া। আনন্দপুর গ্রামের উন্নর দিকে আট-দশ ঘর বসতবাড়ি। এই নিয়ে কুমারপাড়া। এখানে সবাই ব্যস্ত। কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন। কেউ-বা এগুলো সারি সারি করে শুকোতে দিচ্ছেন রোদে। পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর চুলা। উঁচু ছেউ টিবির মতো এই চুলা। মাটির পোড়া গন্ধ

পাছি। আর ধোঁয়া বেরোছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ করছে। মামা বললেন, ইঁড়ি কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ হতো। এর অন্য নাম টেরাকোটা। বাংলার অনেক পুরানো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও দিনাজপুরের কাঞ্চিজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। মাটির ফলকে ছবি একে শুকিয়ে পোড়ানোর পর এগুলো এমন সুন্দর হয়ে ওঠে। ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি জোড়া দিয়ে বড় করা যায়। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প। মামা বললেন, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে।

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি ভবনে আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নানা রকম নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের কুমাররা এসব তৈরি করছেন। বললাম, আমরা এসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই।

মামা বললেন, সুযোগমতো এক সময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব।

-সংগৃহীত

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ টেপা পুতুল নকশা শালবন বিহার টেরাকোটা মৃৎশিল্প শখের ইঁড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ নকশা মৃৎশিল্প টেপা পুতুল

ক. এই যে দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি।

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে বলে।

ঝ. আমরা মেলা থেকে অনেক কিললাম।

৩. ঠিক উভয়টিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

- | | |
|----------------------|------------------|
| ১. মোলহাড়িসেম্বর | ২. পহেলা বৈশাখ |
| ৩. একুশে ফেব্রুয়ারি | ৪. পহেলা ফাল্গুন |

খ. মামা কোথায় পড়েন?

- | | |
|----------------------------------|--|
| ১. ঢাকা কলেজে | |
| ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে | |
| ৩. ঢাকার চারুকলা ইনসিটিউটে | |
| ৪. চট্টগ্রামের চারুকলা ইনসিটিউটে | |

গ. মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে -

- | | |
|---------|---------|
| ১. বাঁশ | ২. কাঠ |
| ৩. পানি | ৪. মাটি |

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে -

- | | |
|--------------|--------------|
| ১. চারুশিল্প | ২. মৃৎশিল্প |
| ২. কারুশিল্প | ৪. দারুশিল্প |

ঙ. কুমার সম্মান কিসের কাজ করে -

- | | |
|--------------------|--------------|
| ১. বাঁশের কাজ | ২. কাঠের কাজ |
| ৩. পাকা বাঢ়ির কাজ | ৪. মাটির কাজ |

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন-

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ১. আম ও লাউ পাতা থেকে | ২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে |
| ৩. সরিষা ফুল থেকে | ৪. পান ও চুন থেকে |

ছ. পোড়া মাটির ফলকের অন্য নাম-

- | | |
|---------------|-------------|
| ১. টেপা পুতুল | ২. টেরাকোটা |
| ৩. শখের ইঁড়ি | ৪. মৃৎশিল্প |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?
- খ. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?
- গ. শখের ইঁড়ি কী রকম?
- ঘ. বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?
- ঙ. মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?
- চ. কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।
- ছ. টেরাকোটা কী?
- জ. বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?
- ঝ. মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?
- ঝঃ. মামার বাড়ি রসের ইঁড়ি-প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস, যেমন- কলস, ইঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী! মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক বন্ধু আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বৎস পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।

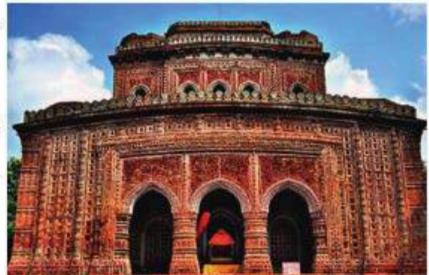
- ক. শিল্পকলা বলতে কী বোঝা?
- খ. শিল্পের কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন?
- গ. কেন কুমারদের কাছে এসব কাজ সহজ?

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝি তা লিখি।

- ক. মৃৎশিল্প
- খ. শখের ইঁড়ি
- গ. টেরাকোটা
- ঘ. টেপা পুতুল

৭. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

কান্তজির মন্দির ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রায় দিনাঞ্জপুরের কান্তজির মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অপূর্ব সুন্দর টেরাকোটা বাহ্যিক মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন।



পাহাড়পুর

নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই সোমপুর বিহারের আশ-পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক সুন্দর টেরাকোটা। এগুলো অষ্টম শতকের অর্ধাং আজ থেকে প্রায় বারো শ বছর আগের তৈরি।



শালবন বিহার

কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টম শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।



মহাস্থানগড়

বগুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় থেকে পরবর্তী পনেরো শতকে বাংলার এ প্রাচীন নগর গড়ে উঠে।



মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক, পাত্র, অলংকার ও মূর্তি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা কুমারপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই।

অথবা

আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে শিখি।

শব্দদূষণ

সুকুমার বড়োয়া

গরু ডাকে হাঁস ডাকে-ডাকে কবুতর
গাছে ডাকে শত পাখি সারা দিনভর।
মোরগের ডাক শুনি প্রতিদিন ভোরে
নিশিরাতে কুকুরের দল ডাকে জোরে।
দোয়েল চড়ুই মিলে কিচির মিচির
গান শুনি ঘুঘু আর টুনটুনিটির।



শহরের পাতি কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘূম দেয়া মুশকিল হর্নের হাঁকে।
সিডি চলে, টিভি চলে, বাজে টেলিফোন
দরজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
গলিপথে ফেরিঅলা হাঁকে আর হাঁটে
ছেটদের হইচই ইশকুল মাঠে।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহরে জীবন জ্বালা-শব্দদূষণ।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নিশিরাত কিচির মিচির ফেরিঅলা শব্দদূষণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফেরিঅলা নিশিরাত শব্দদূষণ কিচির মিচির

ক. চেঁচামেটি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খ. ডোর বেলাতেই পাখির শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙ্গে।

গ. হাঁক দিচ্ছে—থালাবাসন চাই?

ঘ. আমাদের শোনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?

খ. শহরে কী কারণে শব্দদূষণ হয়?

গ. কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?

ঘ. গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?

৪. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

| বিষয়বস্তু | শহুরে জীবন | গ্রামের জীবন |
|------------|------------|--------------|
| পরিবেশ | | |
| শব্দ | | |
| রাস্তাধাট | | |
| জীবনযাত্রা | | |
| হাটবাজার | | |

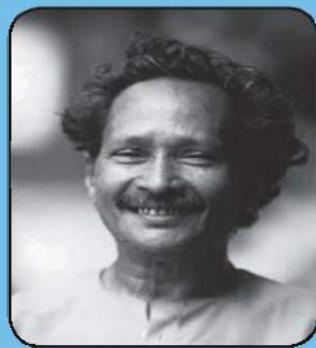
৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা-শব্দদূষণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার
রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ
অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

কবি-পরিচিতি



সুকুমার বড়ুয়া বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। তিনি ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : পাগলা ঘোড়া, ভিজে বেড়াল, চন্দনা রঞ্জনার ছড়া, এলোপাতাড়ি, নানা রঞ্জের দিন, চিচৎকাঁক প্রভৃতি। তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

সুকুমার বড়ুয়া

ঘৱণীয় যাঁরা চিরদিন

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আমরা দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি। এই বিজয়কে পাওয়ার আগে দেশবাসীকে করতে হয় এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন পাবিস্তানি শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে। দেশের অন্য সব সাধারণ মানুষ তাঁদের জুগিয়েছেন ভরসা ও সাহস। অপেক্ষা করেছেন শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার। সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা প্রাণ দেন। আর দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁরা ছিলেন নানা পেশার—কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক। আরও ছিলেন শিক্ষক, সাধাদিক, সরকারি কর্মকর্তা ও নানা পেশার লোক। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে ভেঙ্গা আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবনযাপন করতে পারছি। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। সেই অসংখ্য মহান আত্মানকারীদের কয়েকজনের কথা আমরা জেনে নিব।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে যাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরন্তর, ঘূমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘূমন্ত মানুষকে। সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে বিরামহীন। চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে। পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনাও করে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আগোকিত ও বরেণ্য মানুষদের। পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তারা।



কিব্রিচন্দ্র দেব



সেলিনা পারভীন



মিরানুরুদ্দিন আহমেদ

হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনী। পাক্ষটি কিছু লোকজন যোগ দেয় ওই সব বাহিনীতে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের ওই হত্যা পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে।



মুনিরুজ্জামান
রঞ্জনসাদ সাহা



মুনীর চৌধুরী



মাসীদুল হাসান

পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায় নি। হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও। বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। এই কুরআন পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর এই দুই শিক্ষককেই গুলি করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ সরল আর নিরহংকার। ওই একই রাতে তাঁকেও হত্যা করে তারা। হত্যা করে আরও কয়েকজন শিক্ষককে।

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রম্য হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক ‘সংবাদ’ অফিসে আগুন দেয়। লেখক ও সাংবাদিক শহিদ সাবের সে রাতে ঐ অফিসেই ঘূমাছিলেন। ঘুমস্ত অবস্থায় সংবাদ অফিসে পুড়ে মারা যান তিনি। শহিদ হন সেগুলো পারভীন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা।

তারা হত্যা করে প্রথ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেশ্বনাথ দণ্ডকে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা তাঁকে হত্যা করে। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আযুর্বেদীয় একটি প্রতিষ্ঠান সাধনা উৎসধালয়। ৮৪ বছর বয়স্ক এই মানুষটিও রেহাই পান নি পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে। তাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মজাল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদীপসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত ‘দানবীর’ বলে। হত্যা করা হয় তাঁকে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নৃতনচন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনারা তাঁকেও রেহাই দেয় নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের শরণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে। তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে উঠে একটি গান- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঞ্জনো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুঁগিতে পারি’। এ গানে সূর দেন আলতাফ মাহমুদ। প্রতিভাবান এই সুরসাধকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা জানে এদেশের মনস্বী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সহায়তায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। বিভিন্ন আবাসস্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান, যশস্বী ও প্রতিভাবানদের। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েন না।

শত্রুরা তুলে নিয়ে যায় প্রথ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, প্রথ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাবী, আবদুল আলীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহু জনকে। এঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের কোনো সন্ধানও পাওয়া যায় নি।



শহিদুল্লাহ কাফুরসার



আনোয়ার পাশা



ফজলুল হাকে

তাঁদের মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা পালন করি ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’। এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রাণদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা তাঁদের মরণ করব চিরদিন। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তুলব। তবেই তাঁদের খণ্ড শোধ করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অবরুদ্ধ অবধারিত আআদানকারী নির্বিচারে বরেণ্য পাষ্ট মনষী যশষী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|--------|------------|------|-------|------|
| অবরুদ্ধ | অবধারিত | আআদানকারী | বরেণ্য | নির্বিচারে | যশষী | পাষ্ট | মনষী |
|---------|---------|-----------|--------|------------|------|-------|------|

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয়।

খ. দেশের ভিতরে জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন
এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও
মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান হিসাবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে নিন্দিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক।

ছ. কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে।

জ. রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক চিন্তাবিদদের হত্যা করে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

খ. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।

গ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষ্য করার দাবি
জ্ঞানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

ঘ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

ঙ. রণদাপ্রসাদ সাহকে কেন দানবীর বলা হয়?

চ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে
লিখি।

ছ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের ঝরণ করব?

জ. কোন দিনটিকে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

ঝ. আমরা কীভাবে শহিদদের ঝণ শোধ করতে পারি?

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য

মেধাবী

মেধা আছে এমন যে জন

নিরহংকার

অহংকার নেই যার

বরেণ্য

বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা

অপূরণীয়

কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন

নির্বিচার

৫. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) টিক দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে ?

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ | ২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ |
| ৩. ১৯৭১ সালের উন্ত্রিশে মার্চ | ৪. ১৯৭১ সালের ছাবিশে মার্চ |

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয় -

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ১. ‘স্বাধীনতা দিবস’ হিসেবে | ২. ‘মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে |
| ৩. ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে | ৪. ‘বিজয় দিবস’ হিসেবে |

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় -

- | |
|---------------------------------------|
| ১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে |
| ২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে |
| ৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে |
| ৪. সৎবাদপত্র অফিসে |

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। কাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|------|-------|------|---------|-----|-----|
| ঘুমন্ত | জাগ্রত | স্বাধীন | পরাধীন | সাধু | অসাধু | লোভী | নির্লোভ | সরল | গরল |
|--------|--------|---------|--------|------|-------|------|---------|-----|-----|

ক. অবস্থায় সৎবাদ অফিসে শহিদ হন শহিদ সাবের।

খ. দেশ হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।

গ. এদেশের কৃষক জীবনযাপন করে।

ঘ. বাংলাদেশে অনেক সন্ন্যাসী বাস করে।

ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও।

৭. ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী’ সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

স্বদেশ

আহসান হাবীব

এই যে নদী
নদীর জোয়ার
নৌকা সারে সারে,
একলা বসে আপন মনে
বসে নদীর ধারে—
এই ছবিটি চেনা।

মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাথি—
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ
নানা কাজের মানুষগুলো
আছে নানান বেশ।
মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর
হাটের মানুষ হাটে।
দেখে দেখে একটি ছেলের
সারাটি দিন কাটে।





এই ছেলেটির মুখ
সারাদেশের সব ছেলেদের
মুখেতে টুকটুক।
কে ভূমি ভাই,
প্রশ্ন করি যখন
'ভাগোবাসার শিল্পী আমি'
বলবে হেসে তখন।

‘এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান পাখপাখালি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই রঙ, তবুও
আঁকতে পারি সবই।’

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। ‘স্বদেশ’ কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে লৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি – সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি টুকটুক শিল্পী পাখপাখালি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে শিল্পী পাখপাখালির কড়ি

ক. এদেশে আগে এখনকার মতো টাকাপয়সা ছিল না। লোকে কেনা-বেচা
করত দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্র।

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় কলকাকলি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

ঘ. ‘সব মিলে এক ছবি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।



বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। শস্য-শ্যামল বাংলাদেশের মাঠে মাঠে নানা ফসলের খেত। গাছে
গাছে পাথি। ঝুঁকে বেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর এক দিকে
পাহাড় আর অন্য দিকে সাগর। সবকিছুতেই প্রকৃতির এক
অপরূপ ছোয়া। শিল্পী রং-তুলি দিয়ে এ প্রকৃতিরই ছবি আঁকেন।
কখনো কখনো তা বিক্রি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু
শান্ত-শ্যামল প্রকৃতির এই মন জুড়ানো ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে
কেনা যায় না।

খ. মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ।



সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে
মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে।
মনে হয়, নদীর টেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবারিত খোলা
সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে
মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর
মাঠ চলে গেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

গ. এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,



নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র সব মিলে এদেশ ছবির মতো।
এদেশের প্রতিটি খন্তু বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের
দেশ এটা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে রং বদলায়। যেমন ছবিতে
নানান রং ব্যবহার করা হয়। এদেশের মানুষজনও
নানারকমের বেশভূষা পরেন। সব মিলিয়ে সুন্দর এদেশ।



৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) কর দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা হিল?

- ১. জেলেদের জাল
- ২. গাছের গাঁড়ি
- ৩. খড়ের গাদা
- ৪. নৌকা

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে ?

- ১. খেলাধূলা করে
- ২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে
- ৩. পড়াশোনা করে
- ৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

গ. ‘স্বদেশ’ কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?

- ১. রং-তুলি দিয়ে
- ২. পেনসিল দিয়ে
- ৩. নিজের মনের মধ্যে
- ৪. মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

ঘ. ‘স্বদেশ’ কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?

- ১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি
- ২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
- ৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি
- ৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

ঙ. ‘এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক’ – কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?

- ১. ছেলেটির মুখের রং
- ২. ছেলেটির মুখের গড়ন
- ৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি
- ৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

‘এই যে ছবি

.....মতো দেশ,
দেশের মানুষ
 নানা রকম বেশ,
 বাড়ি বাগান

সব মিলে এক.....
 নেইনেইতবুও
 আঁকতে পারি সবই।’

৮. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

- ক. একজা বসে আপন মনে বসে। পুরুর পাড়ে/গাছের তলে/নদীর ধারে
 খ. এমনি পাওয়া এই ছবিটি নয় কেনা। টাকায়/কড়িতে/ সোনায়
 গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি। হলুদ পাথি/জারুল ফুল /শালিক পাথি

৯. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাথি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।

কবি-পরিচিতি

কবি আহসান হাবীব ২ৱা জানুয়ারি ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার ছবি ও শব্দ সহজেই মন কাঢ়ে। তিনি ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। তিনি দীর্ঘদিন নানা পত্রিকার সাহিত্যের পাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘বৃক্ষ পড়ে টাপুর টুপুর’ ও ‘ছুটির দিন দুপুরে’ তাঁর শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ। ১০ই জুলাই ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



আহসান হাবীব

କାଥଳମାଳା ଆର କୀକନମାଳା

ଅନେକ ଦିନ ଆଗେର କଥା । ଏକ ଦେଶେ ଛିଲ ଏକ ରାଜ୍ଞୀ । ରାଜ୍ଞୀର ଏକଟାଇ ପୁତ୍ର । ରାଜପୁତ୍ରେର ସଙ୍ଗେ
ସେଇ ରାଜ୍ଞୀର ରାଖାଲ ଛେଲେର ଖୁବ ଭାବ । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରସପରକେ ଖୁବ ଭାଲୋବାସେ । ରାଖାଲ ମାଠେ ଗର୍ବ
ଚରାୟ, ରାଜପୁତ୍ର ଗାହତଳାୟ ବସେ ତାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ । ନିଯମ ଦୂପୁରେ ରାଖାଲ ବୀଶି ବାଜାୟ ।
ରାଜପୁତ୍ର ତାର ବନ୍ଧୁ ରାଖାଲେର ଗଲା ଜଡ଼ିଯେ ବସେ ସେଇ ସୂର ଶୋନେ । ବନ୍ଧୁର ଜନ୍ୟ ବୀଶି ବାଜିଯେ ରାଖାଲ
ବଡ଼ ସୁଖ ପାଇ । ଆର, ତା ଶୁଣେ ରାଜପୁତ୍ରେର ମନ ଖୁଶିତେ ବଲମଲିଯେ ଓଠେ । ରାଜପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁର କାହେ
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ, ବଡ଼ ହେଁ ରାଜ୍ଞୀ ହଲେ ରାଖାଲକେ ତାର ମତ୍ତ୍ଵୀ ବାନାବେ ।



তারপর একদিন রাজপুত্র রাজা হয়। শোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে গমগম করে তার রাজপুরি। রাজপুরি আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ। এত সুখের মধ্যে রাখালক্ষ্মুর কথা মনে পড়ে না। রাজপুত্র বশ্মুকে ভুলে যায়।

এদিকে, রাখালক্ষ্মুর কিন্তু খুব মনে পড়ে বশ্মু রাজপুত্রের ব্যথা। শেষে সে একদিন চলেই আসে বশ্মুকে একটুখানি দেখার জন্য। কিন্তু রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা অমন গরিব রাখালকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। মনভরা কষ্ট নিয়ে সারাদিন প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাজার দেখা মেলে না। দিনশেষে মনের কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল চলে যায়, কেউ তা জানে না।

এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু ডোরবেলা যখন তার ঘূম ভাঙ্গে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুণতি সুচ। রাজা কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। রাজ্যস্থুড়ে কাল্লাকাটির রোল পড়ে যায়। রাজা বোঝেন – প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সেই অপরাধেই আজকে তার এই দশা। রানি কাঞ্চনমালা চোখের জল মুছতে মুছতে রাজ্য দেখাশোনা শুরু করেন।

কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে যান। কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো। এসে তাকে বলে, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তো সে দাসী হবে। রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য একজনের দরকার ছিল রানি কাঞ্চনমালার। মেয়েটাকে সেই কাজের জন্য নিয়ে নেন রানি। নদীর ঘাটে গেছেন রানি, সঙ্গে কী করে থাকে টাকাকড়ি! তখন হাতের সোনার কাঁকন দিয়েই রানিকে কিনতে হয় ওই দাসী। তাই তার নাম কাঁকনমালা।

গায়ের গয়নাগুলো কাঁকনমালার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান রানি। চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নেয়। রানি ডুব দিয়ে উঠে দেখেন দাসী হয়ে গেছে রানি, আর রানি কাঞ্চনমালা হয়ে গেছেন দাসী।

নকল রানি কাঁকনমালার ভয়ে কাঁপতে থাকে কাঞ্চনমালা। কাঁপতে থাকে রাজপুরীর সকলে। সকলে ভাবতে থাকে, তাদের রানি তো আগে এমন ছিল না।

সুচিংবিধা রাজা জানতেই পারেন না, তার রাজ্যে আরেক কী ঘোর ঝামেলা এসে গেছে। দুর্ধিনী কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন। চোখের জল ফেলেন।



হাতে কাঞ্চনমালার একটুও ফুরসত থাকে না। কীভাবে সুচরাজার যত্ন করবে! কীভাবে তার পাশে দৃ-দঙ্গ বসবে! নকল রানি রাজার দিকে ফিরেও তাকায় না। রাজার কষ্টের সীমা থাকে না। সুচিংবিধা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

একদিন নকল রানি কাঞ্চনমালাকে একগাদা কাপড় ধুতে পাঠায় নদীর ঘাটে। মাথায় কাপড়ের বোৰা নিয়ে কাঞ্চনমালা এক পা এগোন এক পা থামেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে থাকে। এমন সময় কাঞ্চনমালা শোনেন, বনের পাশের গাছতলা থেকে কেমন এক অঙ্গুত মন্ত্র। কে জানি বলেই যাচ্ছে:

পাই এক হাজার সুচ
তবে খাই তরমুজ!
সুচ পেতাম পাঁচ হাজার
তবে যেতাম হাট বাজার!
যদি পাই লাখ
তবে দেই রাজ্যপাট!



ମାଥାର ବୋକା ନାମିଯେ
କାଞ୍ଚନମାଳା ଯାନ ଛୁଟେ ତାର
କାହେ । ବଶେନ, ଲାଖ ଲାଖ
ସୁଚ ଚାଓ ତୋ ? ଆମି ଦିତେ
ପାରି । ଏ କଥା ଶୁନେ ସେଇ ମାନୁଷ ଝଟପଟ

ତାର ସୁତାର ଶୁଟୁଳି ତୁଲେ ନିଯେ କାଞ୍ଚନମାଳାର ସାଥେ ହାଟା ଧରେ । ସେତେ ସେତେ ପଥେ କାଞ୍ଚନମାଳା
ଚୋଥେର ଜଳ ଫେଳତେ ଫେଳତେ ଦୁଃଖେର ସବ କଥା ବଲେ । ଅଚେନା ମାନୁଷ ଶୋନେ, ମୁଖ ଥମଥମେ ହୟେ
ସେତେ ଥାକେ ତାର ।

ରାଜପୂରୀତେ ଗିଯେ ଓଇ ଅଚିନ ମାନୁଷ ସୁଚ ନେବାର କଥାଟାଓ ବଲେ ନା । ବଲାତେ ଥାକେ ଅନ୍ୟ କଥା । ବଲେ,
ଆଜକେର ଦିନ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ । ଆଜ ହଞ୍ଚେ ପିଟକୁଦୁଲିର ବ୍ରତ, ଆଜକେର ଦିନେ ରାନିଦେର ପିଠା ବିଲାତେ
ହୟ- ଏମନଇ ନିୟମ । ନକଳ ରାନି ପିଠା ବାନାତେ ଯାଇ । ସେ କାଞ୍ଚନମାଳାକେଓ ପିଠା ବାନାତେ ଫରମାସ
ଦେଯ । ନକଳ ରାନି ବାନାଯ ପିଠା । ସେ ପିଠା କେଉ ମୁଖେଓ ତୁଳତେ ପାରେ ନା, ଏମନଇ ବିଶ୍ଵାଦ ! ଦୁଖିନୀ
କାଞ୍ଚନମାଳା ବାନାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୁଣି, ମୋହନବୀଶୀ, କ୍ଷୀର ମୂରଳି ପିଠା । ମୁଖେ ଦେଓଯା ମାତ୍ର ସକଳେର ମନ ଭରେ
ଯାଇ । ଏମନଇ ହାଦ ତାର । ନକଳ ରାନି ଉଠାନେ ଆଜନା ଦିତେ ଯାଇ । କୋଥାର ନକଶା କୋଥାର କୀ-
ଏଖାନେ ଏକ ଖାବଳା ରଂ ଲେପେ ଦେଓଯା, ଓରାନେ ଏକ ଖାବଳା ଲେପା । ଦେଖତେ ସେ କି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯ ।
ଆର କାଞ୍ଚନମାଳା ଆକେନ ପଦ୍ମଲତା । ତାର ପାଶେ ଆକେନ ସୋନାର ସାତ କଣସ, ଧାନେର ଛଡା, ମୟୁର-
ଙ୍ଗୁତୁଳ । ଲୋକେ ତଥନ ବୁଝାତେ ପାରେ କେ ଆସିଲ ରାନି, ଆର କେ ଦାସୀ ।

তখন সেই অচেনা মানুষটা কাঁকলমালাকে ডাক দেয়, বলে—হাতের কাঁকনে কেনা দাসী, জলদি
সত্য কথা বল। কাঁকলমালার সেকি রাগ। সে গর্জে উঠে জল্লাদকে হুকুম দেয়, অচেনা মানুষ
আর কাঁকলমালার গর্দান নিতে। জল্লাদ শব্দের ধরতে আসার আগেই অচেনা মানুষ তার সুতার
পুঁটলিকে হুকুম দেয়। এক গোছা সুতা গিয়ে জল্লাদকে আঞ্চেপৃষ্ঠে বিধে ফেলে। নকল রানি আবার
গর্জে ওঠার আগেই অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র পড়া ধরে:

সূতন সূতন সরুলি, কোন দেশে ঘৰ
সুচ রাজাৰ সুচ গিয়ে আপনি পৱ।

সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ সুতা রাজাৰ গায়ের লাখ লাখ সুচে ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন
মানুষ। সব সুচ রাজাৰ শরীৰ থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানিৰ চোখেমুখে বিধে যায়। জ্বলা
যন্ত্ৰণায় ছটফট করে। নকল রানি শেষে মারা যায়। কাঁকলমালার দুঃখের দিন শেষ হয়।



এদিকে, রাজা বহু বছর পরে চোখ মেলেন। সামনে কে যেন দাঢ়িয়ে! কে! সেই রাখালবন্ধু! রাজা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে। রাজা ক্ষমা চান তাঁর বন্ধুর কাছে। কথা দিয়ে কথা রাখেন নি। রাজা বলেন, “আজ থেকে ভূমি আমার মন্ত্রী। এই রাইল রাজ্য আমার, শুধু ভূমি আমার পাশে থেকো! সারা জীবনের জন্য থেকো!” রাখাল বন্ধু কি তখন না থেকে পারে!

রাজা তাঁর বন্ধুকে নতুন সোনার বাঁশি গড়িয়ে দেন। রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করে, প্রজাদের দুঃখ সরিয়ে তাদের মুখে হাসি আনে। সারাদিনের কাজ শেষে রাজা বন্ধুকে নিয়ে যান। পুরানো দিনের মতো রাখালবন্ধু তখন বাঁশি বাজায়, আর রাজা সেই সুর শোনেন। সুখে রাজার মন ভরে ওঠে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আফেপৃষ্ঠে গর্দান গর্জে ওঠা স্বাদ বিস্বাদ পুটলি ফরমাস ঘোর ফুরসত
টন্টন চিনচিন মায়াবতী কাঁকন রক্ষী রাজপ্রাসাদ পরস্পর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের বিস্বাদ আফেপৃষ্ঠে পুটলিটি ফুরসত টন্টন

ক. তার হাতের রান্না এমন যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃন্দ লোকটি তার স্বতন্ত্রে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় করছে।

ঙ. তারা দুজন বন্ধু।

চ. গ্রামের মায়া ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর বাঁশি শুনত?
- খ. রাজপুত্র রাখাল বন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?
- গ. রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?
- ঘ. তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ?
- ঙ. অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?
- চ. তুমি কী মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?
- ছ. কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?
- জ. রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?
- ঝ. কাথনমালা এবং কাঁকনমালার চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।
- ঝঃ. গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? বর্ণনা দাও।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| কানা | হাসি | চেনা | অচেনা | ভালো | মন্দ | বড় | ছোট | আলো | অন্ধকার |
|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|---------|

- ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না।
- খ. লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।
- গ. রাসেল বয়সে হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।
- ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব মনে হচ্ছে।
- ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারদিকে নেমে এলো।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিম্ন সুখ রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা টন্টন ময়ূর পদ্মলতা চিনচিন ঝলমল বাঁশি রাজ্য

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টন্টন করা – খুব ব্যথা করা। সুচিংথা রাজার শরীর দিনরাত ব্যথায় টন্টন করত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠা – মন আনন্দে ভরে উঠা। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের
মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

৭. গল্পে ‘টন্টন’, ‘থমথম’ এ রকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার শিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

ভন্তন - চারদিকে মাছি ভন্তন করছে।

টন্টন -

ঠৈঠৈ -

রইরই -

কন্কন -

বনবান -

৮. বিপরীত শব্দ শিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য শিখি।

| সুখ | দুঃখ | মা-বাবার মনে কখনো দুঃখ দেয়া উচিত নয়। |
|----------|-------|--|
| মায়া | | |
| স্বাদ | | |
| কষ্ট | | |
| নকশ | | |
| রানি | | |
| রাজপুত্র | | |
| অসুস্থির | | |
| খুশি | | |

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও শিখি।

ক্ষ - ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্ষ - পরিপক্ষ, ক্ষচিং

ঙ্গ - গঙ্ডার, পাঙ্গড়

ণ্ট - ঘণ্টা, কণ্টক

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

পাত্রগণ : পথিক | বুড়িওয়ালা | বৃন্দ | হোকরা | খোকা | মামা |

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ। পিঠে শাঠির আগায় লোটা-বাঁধা গুটি। উক্কখুচক চুল। ভাস্ত চেহারা)

পথিক : নাঃ একাটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেক্ষয় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?



গেরস্তর বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব শুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও লোকজন দেখছি নে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[বুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

বুড়িওয়ালা : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক : না, না আমি তা বলি নি –

বুড়িওয়ালা : না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক : না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিলেন –

বুড়িওয়ালা : চাচ্ছেন না তো, ‘কোথায় পাব’ ‘কোথায় পাব’ কচ্ছেন কেন? খামাখা এরকম করবার মানে কী?

পথিক : আপনি ভুল বুঝছেন – আমি জল চাচ্ছিলাম –

বুড়িওয়ালা : জল চাচ্ছেন তো ‘জল’ বললেই হয় – ‘জলপাই’ বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোধরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙ্গাও তাই? বরকে কি আপনি বরকস্দাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খৌজ করেন?

পথিক : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

বুড়িওয়ালা : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন বুড়ি নিয়ে যাচ্ছি – তবে জল চাচ্ছেন কেন? বুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[বুড়িওয়ালার প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা ধূসিয়া এক বৃক্ষের হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃক্ষ : কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক : আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না – কেবলই সাত-পাঁচ গপ্পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃক্ষ : আরে দূর দূর। ভূমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাও নি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খাসিসপুরে চাকরি করে।

- সেটা তো একটা আন্ত গাধা । ও মুখ্যটা কী বলবে তোমায় ?
 পথিক : কী জানি মশাই-জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল,
 কলের জল, মামা-বাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে-
বৃন্দ
 : হুঁঁ-ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি । তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে
 নিয়েছে । ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা
 জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব -
 পথিক
বৃন্দ
 : না মশাই, গুনিনি-আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই -
 : তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো ? যাও, যাও, মেলা
 বাকিয়ো না-একেবারে অপদার্থের একশেষ ।

[বৃন্দের সশঙ্কে জানালা বন্ধকরণ]

[নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]

[পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল ।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ ।]

- পথিক : ওহে খোকা ! এদিকে শুনে যাও তো ?
 [বৃক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাঢ়ি খোকার মামা বাড়ি হিতে বাহির হইলেন]
 মামা : কে হে ? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ ? - (পথিককে দেখিয়া) ও ! আমি
 মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি ! আপনার কী দরকার ?
 পথিক : আজ্ঞে, জলতেক্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি-তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না ।
 [মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]

- মামা : কেউ বলতে পারলে না ? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন
 দেখি ? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি ।
 [পথিককে মামার ঘরে টানিয়া নেওয়া]

ବିତୀଯ ଦୃଶ୍ୟ

ଘରେର ଭିତର

[ଘର ନାନା ରକମ ଯତ୍ର, ନକଶା, ରାଶି-ରାଶି ବିହିଂ ଇତ୍ୟାଦିତେ ସଞ୍ଜିତ୍ତ]

- ମାମା : କୀ ବଲଛିଲେନ ? ଜଳେର କଥା ଜିଜ୍ଞେସ କରଛିଲେନ ନା ?
- ପଥିକ : ଆଜେ ହଁଁ, ସେଇ ସକାଳ ଥେକେ ହାଁଟିତେ ହାଁଟିତେ ଆସଛି !
- ମାମା : ଆ ହା ହା ! କୀ ଉତ୍ସାହ, କୀ ଆଗ୍ରହ ! ଶୁନେଓ ସୁଖ ହୟ । ଏରକମ ଜାନବାର ଆକାଙ୍କ୍ଷା କ-ଜଳେର ଆଛେ, ବଶୁନ ତୋ ? ବଶୁନ ! ବଶୁନ ! (କତକଗୁଣି ଛବି, ବିହିଂ ଆର ଏକ ଟୁକରୋ ଖଡ଼ି ବାହିର କରିଯା) ଜଳେର କଥା ଜାନତେ ଗେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାନା ଦରକାର, ଜଳ କାକେ ବଲେ, ଜଳେର କୀ ଗୁଣ -
- ପଥିକ : ଆଜେ, ଏକଟୁ ଖାବାର ଜଳ ଯଦି -
- ମାମା : ଆସଛେ - ବ୍ୟକ୍ତ ହବେନ ନା । ଏକେ ଏକେ ସବ କଥା ଆସବେ । ଜଳ ହଚ୍ଛେ ଦୁଇଭାଗ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆର ଏକଭାଗ ଅଞ୍ଜିଜେନ ।
- ପଥିକ : ଏହି ମାଟି କରେଛେ !
- ମାମା : ବୁଝଲେନ ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ଜଳକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରଲେ ହୟ-ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆର ଅଞ୍ଜିଜେନ । ଆର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆର ଅଞ୍ଜିଜେନେର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହଲେଇ, ହବେ ଜଳ ! ଶୁନ୍ଛେନ ତୋ ?
- ପଥିକ : ଦେଖୁନ ମଶାଇ ! କୀ କରେ ସେ କଥାଟା ଆପନାଦେଇ ମାଥାଯ ଢୋକାବ ତା ଭେବେ ପାଇଲେ । ବଲି, ବାରବାର କରେ ସେ ବଲାହି-ତେଷ୍ଟାଯ ଗଲା ଶୁକିଯେ କାଠ ହୟେ ଗେଲ, ମେଟା ତୋ କେଉ କାଲେ ନିଚ୍ଛେନ ନା ଦେଖି । ଏକଟା ଲୋକ ତେଷ୍ଟାଯ ଜଳ ଜଳ କରଛେ, ତବୁ ଜଳ ଖେତେ ପାଯ ନା, ଏରକମ କୋଥାଓ ଶୁନ୍ଛେନ ?
- ମାମା : ଶୁନ୍ଛେହି ବହିକି, ଚୋଥେ ଦେଖେଛି । ବଦିନାଥକେ କୁକୁଡ଼େ କାମଡ଼ାଳ, ବଦିନାଥର ହଲୋ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ- ଯାକେ ବଲେ ଜଳାତଙ୍କ । ଆର ଜଳ ଖେତେ ପାରେ ନା-ଯେହି ଜଳ ଖେତେ ଯାଯ ଅମନି ଗଲାଯ ଥିଚ ଧରେ । ମହା ମୁଶକିଲ ।
- ପଥିକ : ନାଃ ଏଦେଇ ସଜ୍ଜେ ପେରେ ଓଠା ଗେଲ ନା- କେନଇ ମରତେ ଏସେଛିଲାମ ଏଖାନେ ? ବଲି ମଶାଇ, ଆପନାର ଏଖାନେ ନୋତ୍ରା ଜଳ ଆର ଦୁର୍ଗମଥ ଜଳ ଛାଡ଼ା ଭାଲୋ ଜଳ ଖୀଟି ଜଳ କିଛୁ ନେଇ ?
- ମାମା : ଆହେ ବହିକି । ଏହି ଦେଖୁନ ନା ବୋତଳ-ଭରା ଟାଟକା ଖୀଟି ଡିସଟିଲ ଓଯାଟାର- ଯାକେ ବଲେ ପରିଶୁତ ଜଳ ।



[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

- পথিক** : (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায় ?
মামা : না, ও জল খায় না, ওতে তো স্বাদ নেই- একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র
 তৈরি করে আনল- এখনও গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলুম শুনুন- এই যে দেখছেন গুরুগুয়ালা নোঝা জল- এর মধ্যে
 দেখুন এই গোলাপি জল চেলে দিলুম- ব্যস, গোলাপি রং উড়ে সাদা হয়ে গেল।
 দেখলেন তো ?

- পথিক** : না মশাই, কিছু দেখি নি, কিছু বুঝতে পারি নি, কিছু মানি না ও কিছু বিশ্বাস করি না।
মামা : কী বললেন। আমার কথা বিশ্বাস করেন না ?
পথিক : না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিছু
 বিশ্বাস করব না।

- মামা : বটে, কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি— আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।
- পথিক : তা হলে দেখান দেবি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ নেই, পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিছু নেই, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো!
- মামা : এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি— ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঝো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। শুই জলে কী রকম হয়, আর নোংরা জলে কী রকম তফাত হয়, আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল সহিয়া ট্যাপার প্রবেশ]

এই খানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল

কাঢ়িয়া এক নিঃশ্঵াসে চুমুক দিয়া শেষ করা।]

- পথিক : আঃ বাঁচা গেল!
- মামা : (চটিয়া) এটা কী রকম হলো মশাই?
- পথিক : পরীক্ষা হলো— এক্সপেরিমেন্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো? কীরকম হয়?
- মামা : (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন?
- পথিক : আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন— পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খালিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন— আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচোর কোথাকার।

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া সে হাঁকিতে লাগিল — ‘অবাক জলপান’]

অনুশীলনী

১. নাটকাটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’ ছেউ একটি নাটক। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে পথিক, ঝুড়িওয়ালা, বৃদ্ধ, খোকার মামা—এই চারজন লোকের কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি বলা হয়েছে বলে এটি নাটক। ছেউ নাটককে নাটক বলে। ‘অবাক জলপান’ নাটকার কাহিনি হচ্ছে—ভীষণ তৃক্ষার্ত একটি লোক তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে জল দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করল। এটি একটি হাসির গল্প।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ট বরকস্দাজ তেষ্টা খাটিয়া এক্সপেরিমেন্ট বুক্ষমূর্তি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ট বরকস্দাজ এক্সপেরিমেন্ট তেষ্টায় বুক্ষমূর্তি খাটিয়ার

ক. বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি বলেন?

গ. একটা লোক জল জল করছে, তবু জল থেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশ্যে ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা করে বলা যাবে।

চ. লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

৪. প্রশ্নগুলোর উভয় বলি ও শিখ।

- ক. ‘বোবা জল’ বলতে কী বোবায় ?
 খ. ‘জলাতঙ্ক’ কাকে বলে ?
 গ. জলের তেষ্টায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. মনে কর এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। তোমাদের দু জনের বন্ধোপবন্ধন
 কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ।
 ঙ. পথিককে বুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল ? নামগুলো লেখ।
 চ. তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ইচ্ছেমতো একটি নাটকা
 লেখ।

৫. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. অবাক জলপান কোন ধরনের রাচনা ?

- | | |
|------------|------------|
| ১. নাটকা | ২. ছোটগল |
| ৩. প্রবন্ধ | ৪. উপন্যাস |

খ. পথিক বুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল ?

- | | |
|-------------|------------|
| ১. কাঁচা আম | ২. জল |
| ৩. জলপাই | ৪. পাকা আম |

গ. কুকুরে কামড়াগে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল ?

- | | |
|---------------|-------------|
| ১. ডিপথেরিয়া | ২. আমাশয় |
| ৩. জলাতঙ্ক | ৪. টাইফয়েড |

ঘ. পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল ?

- | | |
|---------|---------|
| ১. ৪ জন | ২. ৩ জন |
| ৩. ২ জন | ৪. ৫ জন |

ঙ. বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল ?

- | | |
|----------|----------|
| ১. পঁচিশ | ২. ত্রিশ |
| ৩. দশ | ৪. সাতাশ |

চ. পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল ?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. বালক | ২. মামা |
| ৩. বুড়িওয়ালা | ৪. বৃন্দ |

ছ. নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে ?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. বুড়িওয়ালা | ২. বৃন্দ |
| ৩. বালক | ৪. মামা |

৫. কর্ম-অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নাটিকাটি প্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করি।



কবি-পরিচিতি

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখেছেন। ‘আবোল-তাবোল’, ‘হ-য-ব-র-ল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘বহুরূপী’, ‘খাইখাই’, ‘অবাক জলপান’ তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিদ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুকুমার রায়

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মেত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
ছিড় না নরম পাতা।

শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।

ধরার বুকে স্নেহ-কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
বৃপকথা নীল আকাশের ঝাঁশি—
শুনি আর দুলি বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ যেন তাদের কষ্ট না দেয়—সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই কিরণ ধরা তারারা ফোটে স্নেহ-কণা রূপকথা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায় কিরণ ধরার তারারা স্নেহ-কণা রূপকথার ফোটে

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে মাথা।

খ. সকালে সূর্যের ততটা তীব্র হয় না।

গ. বুকের স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ. আঁধার আকাশে মিটিমিটি করে চায়।

ঙ. ফুল গাছে ফুল।

চ. বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

ছ. মা দিয়ে আমাদের ভরে রাখেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

গ. ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

ঘ. ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

৫. কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি।

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি—
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

ফুলের নাম:

ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:

কোথায় হয়:

ব্যবহার:

কেন প্রিয় ফুল:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৮. পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শেণিতে আবৃত্তি করি।

কবি-পরিচিতি



জ্যোতিরিলাল মৈত্রী ১৯১১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তিনি অনেক উদ্দীপনামূলক দেশপ্রেমের গান লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। সংগীতের শিক্ষক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

জ্যোতিরিলাল মৈত্রী

মাটির নিচে যে শহর

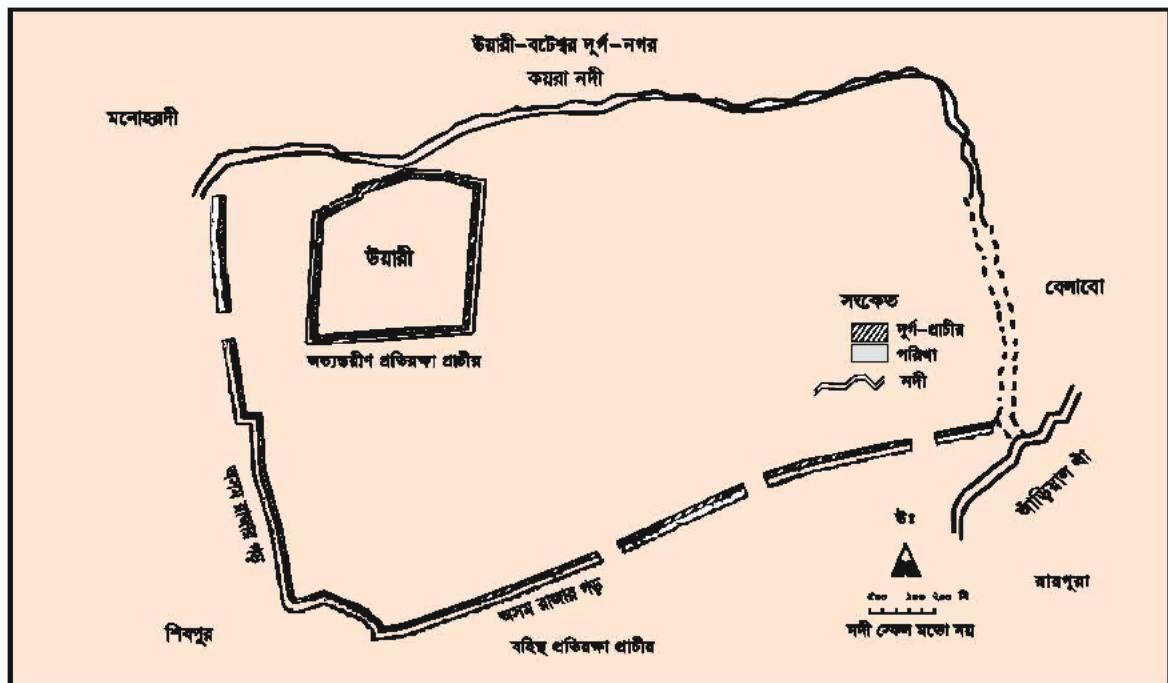
বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। সে সব স্থানের নাম তোমরা হয়তো জান, যেমন- ময়নামতি, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর। এগুলো কোনোটি হয়তো তোমরা দেখেও ধাকবে। সেগুলো সবই মাটির ওপরে, ঢিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়েছে এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা।



প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

কুমিল্লার লালমাই আর বরেন্দ্র অঞ্চলের পাহাড়পুর এবং মহাস্থানগড়ের মতো মধুপুর গড়ের অধিকাংশ ভূমির গঠন একই রকম। এ অঞ্চল মধুপুর গড় নামে পরিচিত। মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরানো। আজ থেকে বহু বছর আগে আমাদের এই দেশের ভূগূঢ় ঠিক এই রকম ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে হয় শতকে বর্তমানের গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য জনমানুষের বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দর নগরী। এখনকার নরসিংহী দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ পেরিয়ে নরসিংহী জেলার বেগাবো উপজেলার দক্ষিণ দিক থেকে প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

এরপর সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন বা নদীভাঙ্গন হয়েছিল কোনো এক সময়ে। ফলে এসব অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বড় রকমের ওলটপালট হয়। ১৮৯৭ সালে প্রচন্ড এক ভূমিকম্প হয় আমাদের দেশে। ফলে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর জনবসতি সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে যায়। এখনো তোমরা দেখে থাকো নদীর পাড়ের জমি, ঘরবাড়ি, গ্রাম আর রাস্তা-ঘাট ভাঙ্গে। আবার বিশাল নদীর অন্য দিকে বিস্তীর্ণ চর পড়ে। শত শত বছর আগে থেকেই এইভাবে চলে আসতে থাকে ভাঙ্গা-গড়া। মাটিচাপা পড়ে যায় এক একটি নগর-জনপদ। মাটি ঝুঁড়ে এমনি এক সুপ্রাচীন নগর-জনপদের দেখা পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। সেই স্থানের নাম নরসিংহদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর। উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংহদীর বেশাবো ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।



আসলে উয়ারী এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় একটা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায়। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো ছিল বঙ্গদেশের এবং ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। সেটাই ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দর্শন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। তিনি তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড ফেলে যান। ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ভারি লোহার পিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ পাঠান বাবাকে নিয়ে

দেখান। তিনি অভিভূত হন। ১৯৫৬ সালে উয়ারী গ্রামে মাটি খননকালে ছাপাইত রৌপ্য মুদ্রার একটি ভাঙ্গার পান তিনি। তাতে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে হাবিবুল্লাহ উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নির্দশন সংগ্রহ করেন। পরে তিনি সেগুলো জাদুঘরে জমা দেন। অনেক পরে ২০০০ সালে এখানে শুরু হয় খনন কাজ। নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। খনন করে পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর। আরও পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভঙ্গার। মুদ্রাগুলো ভারত উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো।

সে সময় শীতলক্ষ্য নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস। ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে তৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ‘উয়ারী-বটেশ্বর’ রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।



প্রাচীন মুদ্রা

উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো জায়গা পাওয়া গেছে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম, যেমন-রাজ্বার টেক, সোনারুতলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গীরাজ্বার বাড়ি, মন্দিরভিটা, জানঁথারটেক, টঙ্গীরটেকে প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মুদ্রা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের যত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা থেকে সহজেই বলা যায়, এখানকার মানুষ যথেষ্ট সভ্য ছিল। এই স্থানের বসতি এলাকাটি সম্ভবত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধ্যাপক সুফি

মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা, এই প্রত্নতত্ত্ব স্থাপত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে ‘সোনাগড়া’ নামে বিশেষজুড়ে পরিচিত ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিবপুর উপজেলা। এখানকার মন্দিরভিটায় এক বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে। জানঁথারটেকে একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আশ্চর্য সব নির্দশন পাওয়া যেতে পারে এই এলাকা থেকে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রত্ত্বতান্ত্রিক উপত্যকা জনগদ প্রাচীনতম অভিভূত নির্দশন প্রিষ্টপূর্ব
ঐতিহাসিক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঐতিহাসিক উপত্যকা অভিভূত নির্দশন প্রাচীনতম

ক. পাহাড়পুর আমাদের দেশে অতি একটি বিহার।

খ. ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য পাওয়া যাচ্ছে উয়ারী-বটেশ্বরে।

গ. উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের নির্দশন।

ঘ. পাহাড় ও পর্বতের মাঝে সমতল ভূমিকে বলে।

ঙ. আমি জাদুঘর দেখে হয়ে গেলাম।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. প্রত্ত্বতান্ত্রিক নির্দশন বলতে কী বোঝা? বাংলাদেশের প্রত্ত্বতান্ত্রিক নির্দশনগুলি সম্পর্কে যা
জান লেখ।

খ. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্ত্বতান্ত্রিক নির্দশন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

গ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির
প্রত্ত্বতান্ত্রিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

ঘ. ক্রমাপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

ঙ. কোন কোন নির্দশন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

ঙ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

৪. বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

ছাপাঞ্জিকত-ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর ওপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা।
বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা ফুল ছাপাঞ্জিকত আছে।

এখানে দুটি শব্দ, ছাপ + অঙ্কিত মিলে হয়েছে ছাপাঞ্জিকত। এই রকম দুই শব্দের মিলন
হলে তাকে বলে সম্মিলিত। যেমন, নীল + আকাশ= নীলাকাশ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রাচীন নির্দশন সংগ্রহ করে জানুয়ারে কে জমা দেন?

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ১. হাসিবুল্লাহ পাঠান | ২. হফিজুল্লাহ পাঠান |
| ৩. হাবিবুল্লাহ পাঠান | ৪. শরিফুল্লাহ পাঠান |

খ. একটি বৌদ্ধবিহারের সম্মান পাওয়া গেছে-

- | | |
|--------------|---------------|
| ১. ভাষানটেকে | ২. জানখারটেকে |
| ৩. টেকেরহাটে | ৪. টঙ্গীরটেকে |

গ. কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. বৃড়িগঙ্গা | ২. ব্ৰহ্মপুত্ৰ |
| ৩. শীতলক্ষ্যা | ৪. মেঘনা |

ঘ. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ বয়ে গেছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?

- | | |
|--------------|-------------|
| ১. মধুপুর | ২. ময়নামতি |
| ৩. পাহাড়পুর | ৪. নরসিংহদী |

ঙ. এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

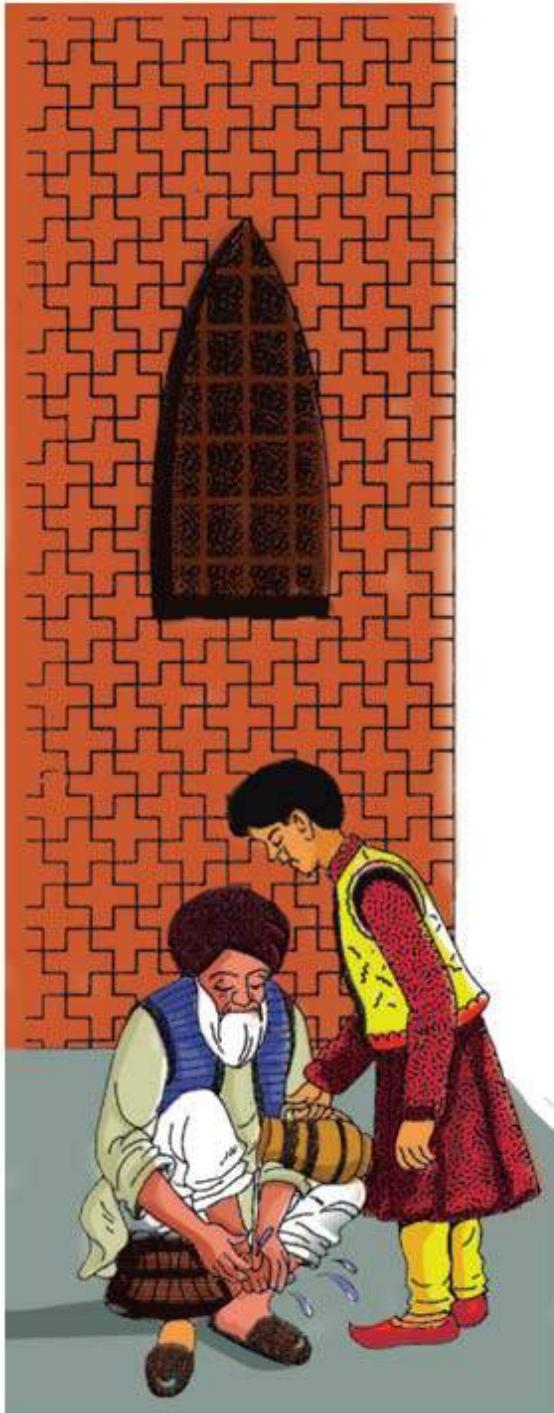
- | | |
|-------------|-------------|
| ১. বুপাগড়া | ২. মনগড়া |
| ৩. সোনাগড়া | ৪. সোনাবুরি |

৬. কর্ম-অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

শিকাগুরুর মর্দাদা

কাজী কানের মণ্ডাই



বাদশাহ আলমগীর-
কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবি দিল্লির ।
একদা প্রভাতে শিয়া
দেখেন বাদশাহ— শাহজাদা এক পাত্র হতে নিয়া
চালিতেছে বাবি গুরুর চরণে
পুরকিত হৃদে আনত—নয়নে,
শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পারের ধূলি
ধূয়ে-মুছে সব করিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি ।

শিক্ষক মৌলবি
ভাবিলেন, আজি নিষ্ঠার নাহি, ঘায় বুঝি তাঁর সবি ।
দিল্লিপতির পুত্রের করে,
লইয়াছে পালি চরণের পরে,
স্পর্ধার কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে— কোন কালে !
ভাবিতে ভাবিতে চিতার খেখা দেখা দিল তাঁর ভালে ।

হঠাতে কী ভাবি উঠি
কহিলেন, আমি ভয় করি নাক, ঘায় ঘাবে শির টুটি,
শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
দিল্লির পতি সে তো কোন ছাই,
সব করি নাক, ধারি নাক ধার, মনে আছে যোর বল,
বাদশাহ শুধালে শান্তের কথা শুনাব অনর্গল ।

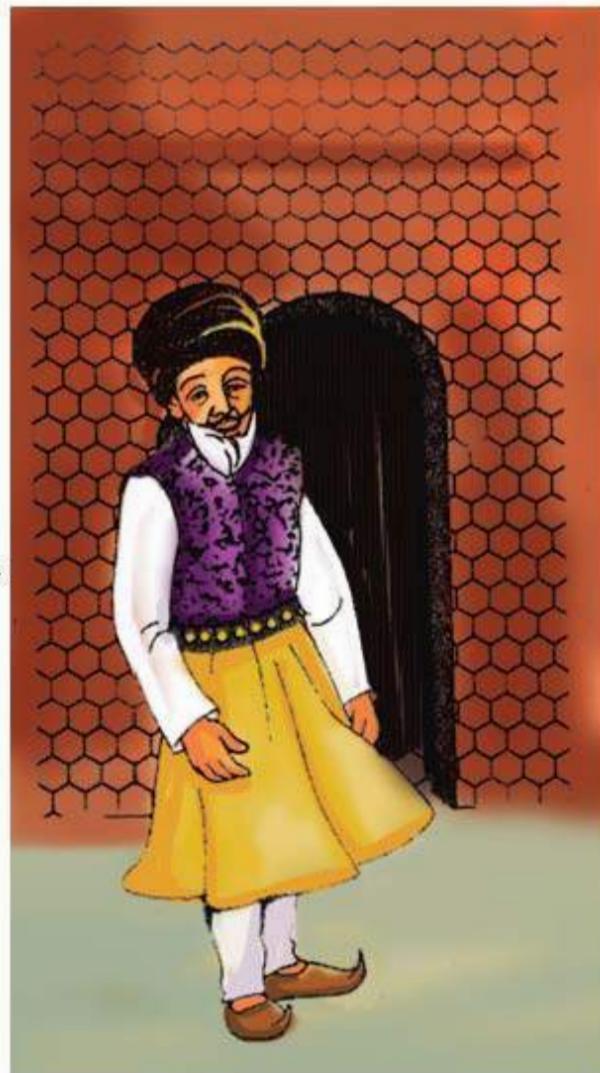
যায় যাবে প্রাণ তাহে,
প্রাপ্তের জয়েও মান বড়, আমি শুনাৰ শাহানশাহে।

তার পঞ্চদিন প্রাতে
বাদশাহৰ দুত শিককে ডেকে নিয়ে গেল কেন্দ্রাতে।
খাস কামৰাতে যবে
শিককে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্ৰ আমাৰ আশনাৰ কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিবাহে?
বৱৎ শিখেছে বেয়াদবি আৱ গুৰুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা ঝয়ৎ সকাল বেলা।'

শিককে কল— 'জাহানা, আমি বুঝিতে পারি নি, হায়,
কী কথা বলিতে আজিকে আমাৰ ডেকেছেন নিৱালায়?'
বাদশাহ কহেন, 'সে দিন প্ৰভাতে

দেখিলাম আমি দাঁড়াৰে তফাতে
নিজ হাতে যবে চৱণ আশনি কৱেন প্ৰকালন,
পুত্ৰ আমাৰ জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চৱণ।
নিজ হাতখানি আশনাৰ পায়ে বুলাইয়া সবজনে
খুঁয়ে দিল নাক কেন সে চৱণ, বড় ব্যথা পাই মনে।'

উচ্ছুস ভৱি শিককে আজি দাঁড়াৰে সংগোৱবে,
কুৰ্ণিশ কৱি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চৱবে—
'আজ হতে চিৰ উন্নত হলো শিকাশুব্রুৰ শিৱ
সত্যই তুমি মহান উদাৰ বাদশাহ আলমগীৰ।'



১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

‘শিক্ষাগুরুর মর্যাদা’ কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাদশাহ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধূয়ে দেবেন। তবেই না তাঁর সন্তান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। বাদশাহ আলমগীর উপলব্ধি করেছিলেন, যে ছাত্র তাঁর শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দিতে জানে না, শিক্ষকের সেবা করতে জানে না, সে কখনো পরিবার, সমাজ ও দেশের উপযোগী মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন কাঞ্চারি। তিল তিল করে নৌরবে নিভৃতে শিক্ষক তাঁর আদর্শ দ্বারা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার উপযোগী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলেন। সমাজ ও দেশের জন্য শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুমার শাহজাদা বারি চরণ শির শাহানশাহ প্রক্ষালন কুর্নিশ

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| কুমার | বারি | চরণ | শির | শাহানশাহ | কুর্নিশ |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|

- ক. পিতার হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল।
- খ. বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণ হয়।
- গ. আগের দিনে হাতি—ঘোড়া চড়ে শিকারে যেতেন।
- ঘ. উজির বাদশাহকে করলেন।
- ঙ. আলমগীর ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ শাসক।
- চ. অন্যায়ের কাছে কখনো নত করব না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?
- খ. একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন?
- গ. বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন?
- ঘ. ‘প্রাণের চেয়েও মান বড়’— শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

ঙ. বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন?

চ. শিক্ষক কী বলে বাদশাহ সুনাম করলেন?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, ‘শুনুন জনাব তবে,

পুত্র আমার আপনার কাছে

সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?

বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,

নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।’

৬. ক্ষ, ঘ, ঘ্র, স্ত্র— প্রত্যেকটি মৃত্যুবর্ণ ব্যবহার করে তিনটি করে শব্দ লিখি। যেমন-

ক্ষ = ক + ষ — ক্ষম, শিক্ষা, সক্ষম

ঘ = স্ + ব —

ঘ্র = স্ + ম —

স্ত্র = স্ + ত্ + র —

৭. বিপরীত শব্দগুলো ঠিকঘো সাজাই।

| | |
|-----|------|
| বড় | অপযশ |
|-----|------|

| | |
|-----|------|
| মান | অবনত |
|-----|------|

| | |
|----|-------|
| ঘশ | বিকাল |
|----|-------|

| | |
|-------|-------|
| বিষাদ | অপমান |
|-------|-------|

| | |
|-------|-----|
| উন্নত | ছোট |
|-------|-----|

| | |
|------|------|
| সকাল | হৰ্ম |
|------|------|

কবি-গবিচিতি



কাজী নাসুরুল ইসলাম

কবি কাজী নাসুরুল ইসলাম ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি পঞ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবগুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও বিটি পাশ করেন। তিনি চাকরি জীবনের প্রথমে ছিলেন সাব ইলেক্পেন্ট, পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নীতিকথা ও কাহিনিমূলক শিখতোষ কবিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ওরা জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভাবুক ছেলেটি

দশ-এগারো বছরের ছেলেটি তেমন দুরস্ত নয়। পড়াশোনায় সে ভালো, খেলাধূলাও করে। তবে সময় পেলেই গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ-বৃক্ষের ব্যাপারটাও দেখে সে। আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। কেন এমন হয়? অবাক বিশ্বায়ে ভাবে সে। ঘড়ে গাছপালা ভেঙ্গে গেলে বাবাকে প্রশ্ন করে।

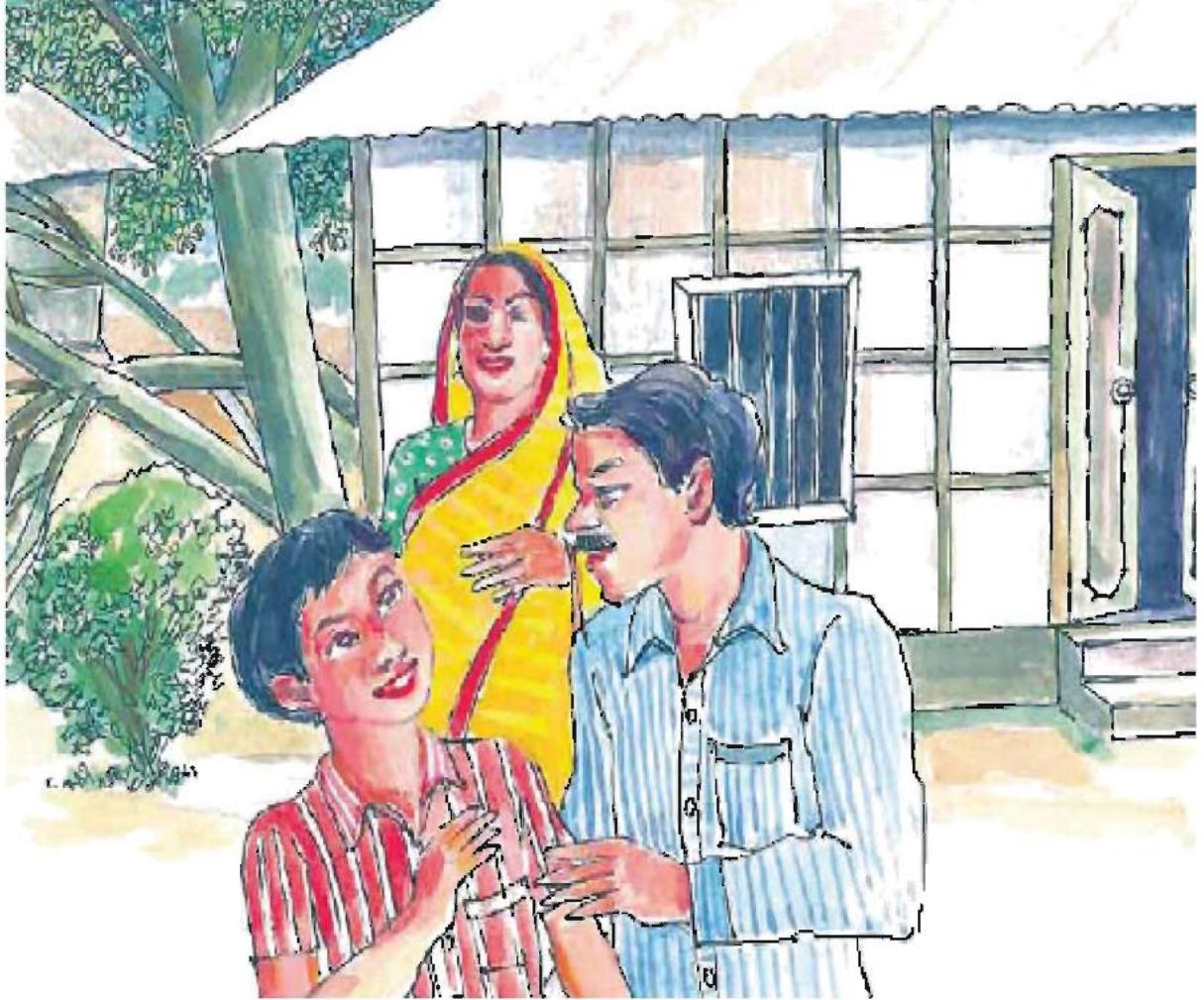
- আচ্ছা বাবা, গাছ ভেঙ্গে গেলে, ওদেরকে কাটলে ব্যথা পায় না?

ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আগে কূলে শিক্ষকতা করেছেন।

ছেলেটির বাবার বাড়ি বিরুমপুরের রাটিখাল গ্রামে। তবে তার জন্য ময়মনসিংহে। ১৮৫৮ সালের ত্রিশে নভেম্বর। ওর পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। তারপর ময়মনসিংহে কূল শিক্ষার ধাপ শেষ করে সে ভর্তি হয় কলকাতায়। সেট জেভিয়ার্স কূল থেকে ১৮৭৪ সালে সে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে। কৃতিত্বের ধারায় সে ১৮৭৮ সালে এফএ পাস করে। তারপর ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে।

সেই ছেলেটিই বড় হয়ে প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক হিসেবে জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করে। তোমরা অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছ কে তিনি? ইঠা, সেদিনকার সেই ভাবুক ছেলেটিই পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।





জগদীশচন্দ্র এক বছর ডাক্তারি পড়ার পর ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন তিনি। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন দেশ ছিল পরাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন তারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করে তাঁকে। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে—এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ধিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

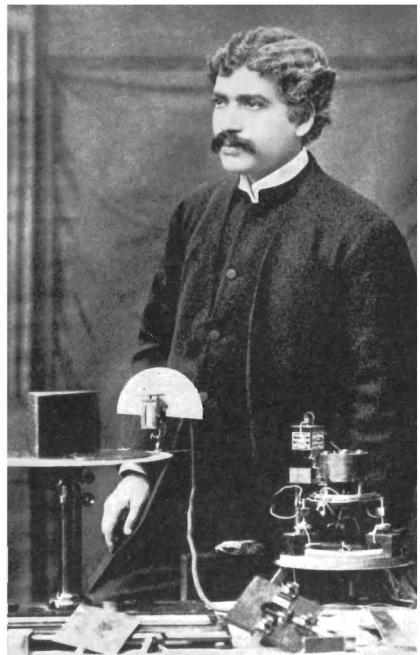
মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়। তাঁর পাঠিয়পূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর আকৰ্ষ্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন: জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।

জগদীশচন্দ্র বাংলাতেও বেশ লিখেছেন, বিশেষ করে তোমাদের মতো শিশুদের জন্য। তাঁর লেখা ‘নিরুদ্ধেশের কাহিনী’ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। এটি পরে ‘পলাতক তুফান’ নামে জগদীশচন্দ্রের ‘অব্যক্ত’ নামক বইয়ে ছাপা হয়। তাঁর লেখা ‘অদৃশ্য আলোক তোমাদের আনন্দ দেবে।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাঁকে ‘নাইট উপাধি’ দেন। তাই তাঁর উপাধিসহ নাম হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর দুই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালিলি-নিউটনের সমকক্ষ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে ১৯৩৫ সালে। জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের গিরিডিতে মারা যান ১৯৩৭ সালের তেইশে নভেম্বর।

ওই সময়ের সেই ভাবুক ছেলেটিই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি বাঙালির গৌরব। সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ।



জগদীশচন্দ্র বসু

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পর্যবেক্ষণ পান্তিয়পূর্ণ বিজয়স্তম্ভ গিরিডি কল্পকাহিনি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
প্রবেশিকা এফএ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিজয়স্তম্ভ কল্পকাহিনি আবিষ্কার কল্প্যাণ পান্তিয়পূর্ণ দূরত্ব পদার্থে

পদার্থবিজ্ঞানের বিদ্যারে বাড়িতে অতিক্ষুদ্র কর্তব্য প্রাণী জীবনের

ক. তাঁর কর্তৃতা শুনে তাঁকে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

খ. দেশের করার জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

গ. জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্চর্য সব দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘ. জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি।

ঙ. জগদীশচন্দ্র বসুর ‘নিরুদ্দেশের কাহিনি’ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক।

চ. ছেগেটি তেমন নয়।

ছ. মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক ভাবে।

জ. ওর পড়াশোনার শুরু।

ঝ. প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

ঝ. প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে পালন করেন।

ট. তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উষ্ণিদ ও মধ্যে অনেক মিল আছে।

ঠ. তিনি তরঙ্গস্থিতি আবিষ্কার করেন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

- ক. ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিলেন ?
- খ. তিনি ছোটবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন ?
- গ. তিনি কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ?
- ঘ. কখন থেকে তিনি ‘বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু’ হয়ে ওঠেন ?
- ঙ. কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন ?
- চ. তাঁর বহুতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে ?
- ছ. বিজ্ঞান শিক্ষা ও চৰ্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ?
- জ. ‘প্লাতক তুফান’ নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল ? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয় ?
- ঝ. অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন ?
- ঞ. ‘তাঁর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।’ এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন ? কেন বলেছিলেন ?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

ক. কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন ?

১. গাছের প্রাণ আছে ২. অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে
৩. মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ৪. বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

খ. জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন ?

১. বাংলা ২. পদাৰ্থবিজ্ঞান
৩. ইংরেজি ৪. গণিত

গ. জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

১. ময়মনসিংহ ২. ঢাকা
৩. কুমিল্লা ৪. ফরিদপুর

ঘ. ‘জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ’ কথাটি কে বলেছিলেন ?

১. বিজ্ঞানী অলিভার লজ ২. বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন
৩. বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৪. বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

- শিক্ষার ধাপ পার - প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়—এর শিক্ষা হলো একটার পর একটা শিক্ষার ধাপ।
- বকেয়া পরিশোধ - কারো নিকট কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেওয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ।
- অন্যতম - বহুর মধ্যে এক হলে তাকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য ‘অন্যতম’ শব্দটি ব্যবহার করা যায়।
- তথ্যের আদান-প্রদান - তথ্য বলতে ঠিক সংবাদ, প্রকৃত অবস্থা বা সত্যকে বোঝাতো। কিন্তু আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার, টেলিভিশন, ফোন, ইন্টারনেটের সাহায্যে যত রকম কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।
- নাইট উপাধি - নাইট উপাধি ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি। এঁদেরকে ‘স্যার’ বলে সম্মোধন করা হয়।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

‘বিজ্ঞান শিক্ষাই সত্যতা বিনির্মাণের একমাত্র হাতিয়ার’ – বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

৭. আমার জানা যেকোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখি।

দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

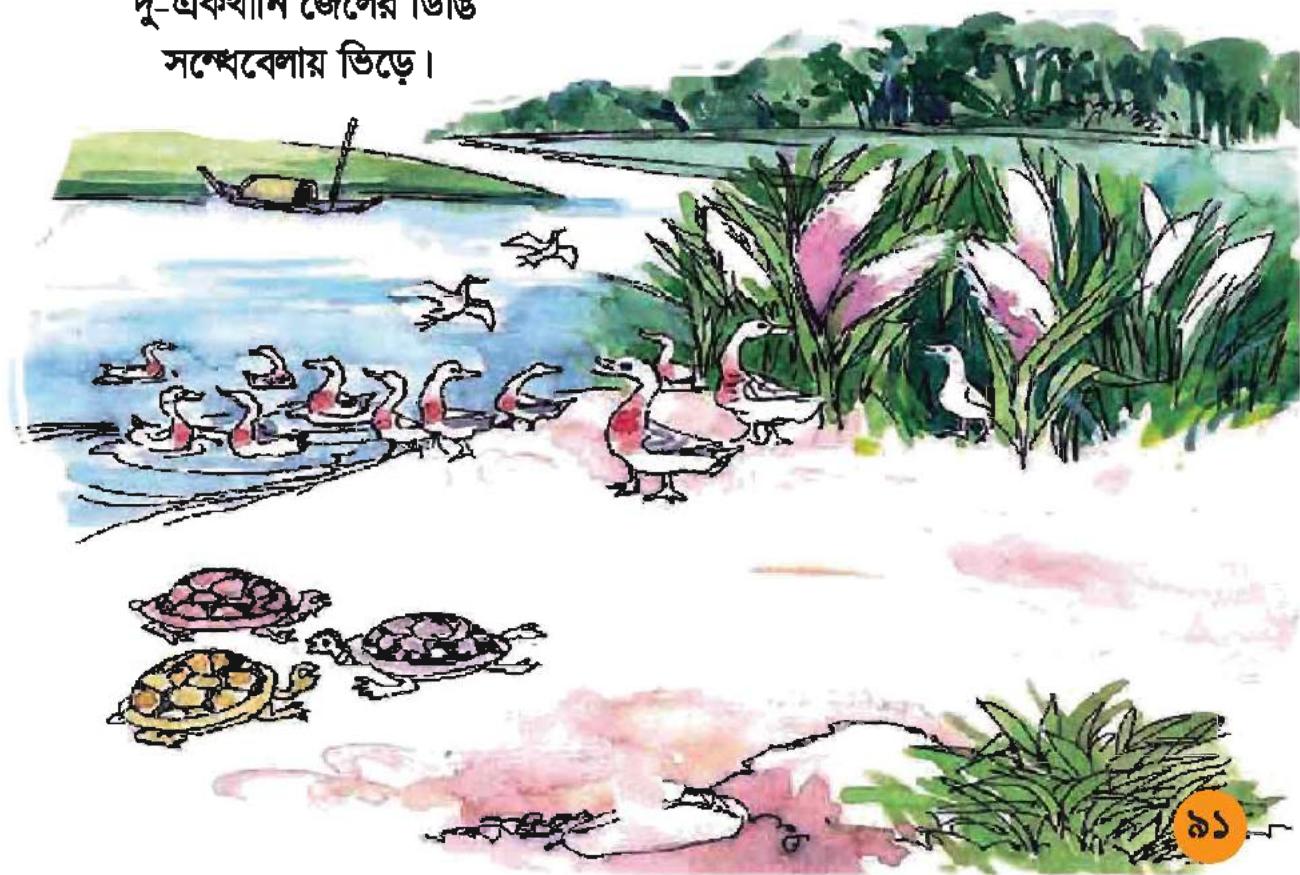
আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশি সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সম্মেবেলায় ভিড়ে।

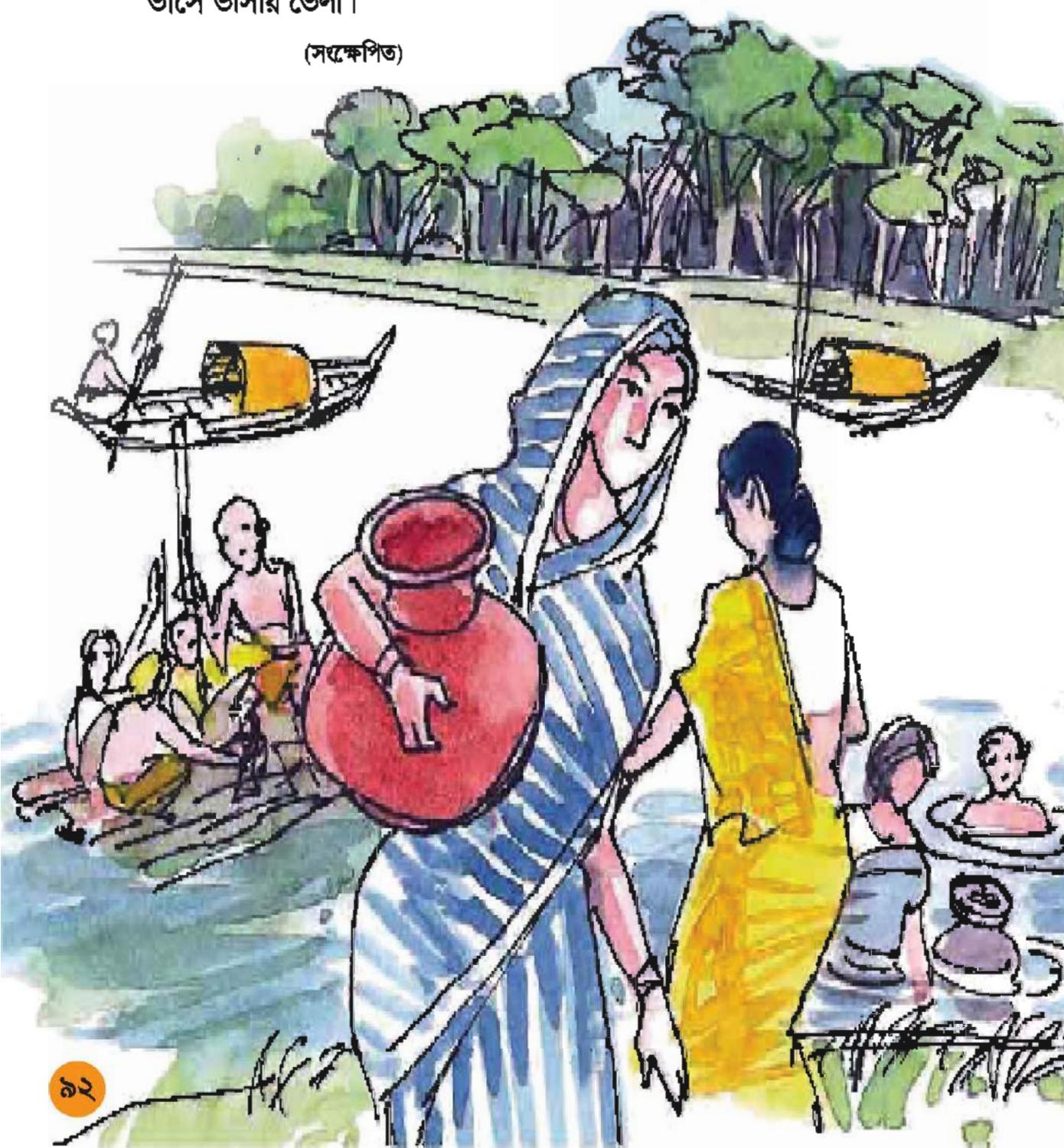
ভূমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গৌথা ঘনছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।



সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা
হেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

(সংক্ষেপিত)



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীরে দু-জন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চকাচকিরা যেখানে ঘর বাঁধে। এর তীরে তীরে ফুটে থাকে কাশফুল। শীতের সময় হাঁসেরা এসে ভিড় করে, কচ্ছপ রোদ পোহায়। সন্ধ্যায় জেলের ডিঙি এসে ভেড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। নদীর ঘাটে বধুরা আসে, ছেলেরা জলে ভেলা ভাসায়। একটি নদী দুই তীরের মানুষকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্জন চকাচকি তট ডিঙি আচ্ছাদন বেণুবন

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চকাচকিরা আচ্ছাদন তটে বেণুবন নির্জন ডিঙি

ক. এলাকাটি এত যে গা ছমছম করে।

খ. নদীর ধারে দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়।

গ. গ্রামের ছোট ছোট নদীগুলো দিয়ে মানুষ করে নদী পারাপার হয়।

ঘ. নদীর দু প্রতিবছর মেলা বসে।

ঙ. নদীর তীরে বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ হিসাবে ব্যবহার করে।

চ. নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা বাতাসে দুলতে থাকে।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।



৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

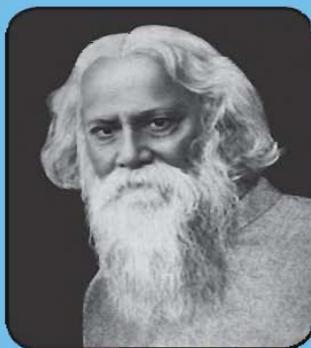
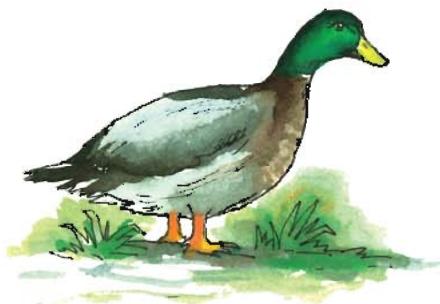
- ক. নদীর বাঞ্ছরে কী ঘটে?
- খ. দুই তীরে দু-জন মানুষের ভালো লাগার জিনিসগুলো কী?
- গ. ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- ঘ. দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?
- ঙ. সকল-সম্মেরেলা ছেলের দল কী করে?

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে একটি কবিতা বা ছড়া লেখার চেষ্টা করি।

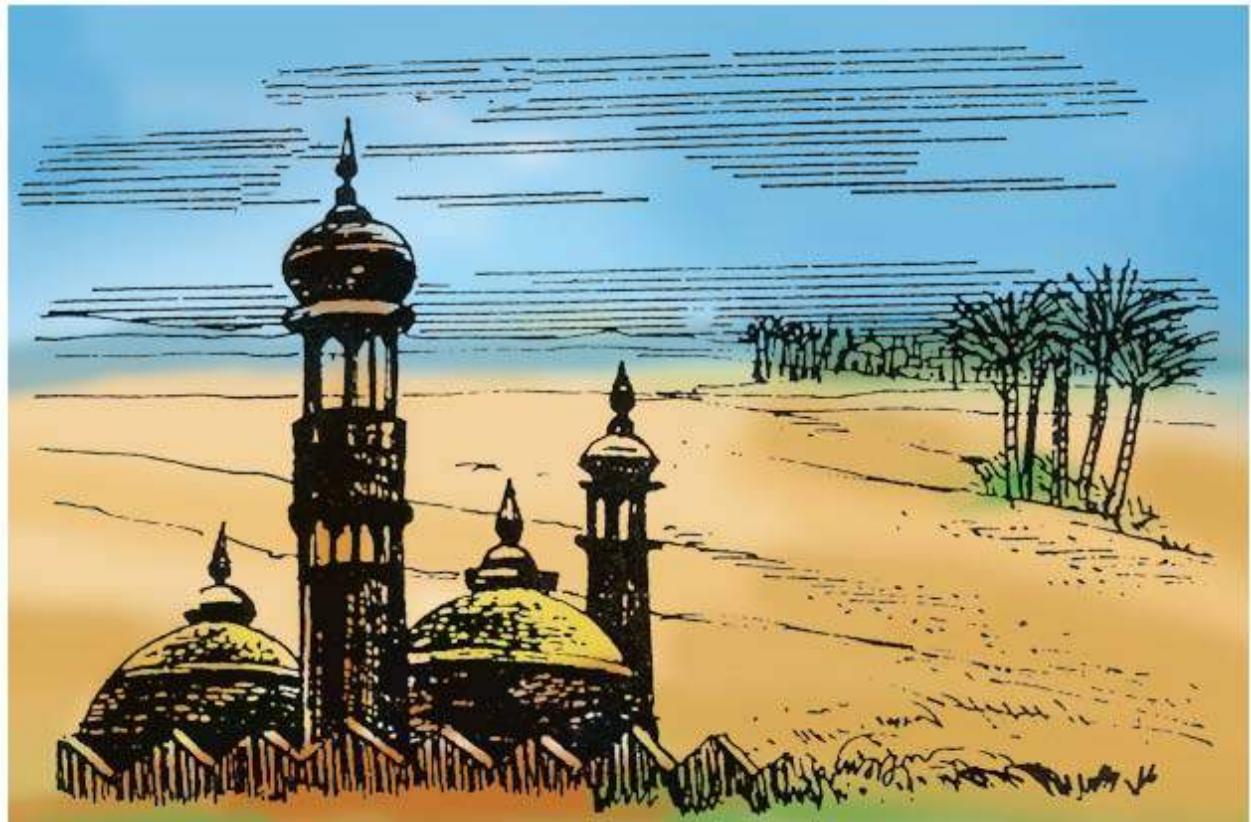
..... মাস,
..... বাঁশ।
..... চর,
..... ঘর।
..... মন,
..... বন।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্পকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাঞ্ছা সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরসূন্দী, চিত্রশিল্পী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনাভাঙ্গার বিশাল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাঞ্ছা সনের ২২শে আবগ, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



বিদায় হজ

দশম হিজরি। আরবদেশের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম প্রচল করেছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী। ইসলামের এ বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দশম হিজরির হজের সময় এসে গেল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অভরের গভীরে কাবার আহ্মান অনুভব করলেন। তিনি স্থির করলেন সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করবেন। এই সংবাদ চারদিকে দৃঢ় ছড়িয়ে পড়ল।

যিলকাদ মাস। নবিজির (স) কাছে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে হজ পালন করবেন। যিলকাদ মাসের শেষ দিকে মহানবির (স) সঙ্গে তাঁরা মক্কার পথে যায়। যায়া তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁয়াও এই মহামানবকে এক বার দেখার জন্য কাবাশরিফে এলেন।

আরব দেশের নানা স্থান থেকে সেবার প্রায় দুই লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন। আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবির (স) মন আনন্দে ভরে গেল। এত মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজির (স) এটিই শেষ ভাষণ। আর তাই এটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তাঁর এই ভাষণকে গভীর শুন্ধায় স্মরণ করবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। আজকের এই দিন তোমাদের কাছে পবিত্র। এ মাসটিও তেমনি তোমাদের কাছে পবিত্র। তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরম্পরের কাছে পবিত্র।

মনে রেখ, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।

তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তাই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তাই পরতে দেবে।

কেনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ-মর্যাদার কথা বলবে না।

মনে রেখ, সব মুসলমান একে অন্যের তাই। তোমরা এক ভাই কখনও অন্য ভাইয়ের সম্পত্তি জোর করে দখল কর না।

কখনও অন্যায় এবং অবিচার কর না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আজ যারা এখানে আসে নি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌছে দিও। হয়ত এই উপদেশ তারা বেশি করে মনে রাখবে।

মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না।

মহানবি জোর দিয়ে বললেন :

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না।

মহানবি (স) চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন। এই চারটি কথা হলো :

- আশ্রাহ ছাড়া অন্য কারণ উপাসনা কর না।
- অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা কর না।
- পরের সম্পদ অপহরণ কর না।
- কারণ ওপর অভ্যাচার কর না।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আরও বললেন :

তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস ক্ষেত্রে যাচ্ছি।

এক. আশ্রাহৰ বাণী অর্থাৎ কুরআন।

দুই. আশ্রাহৰ প্রেরিত পুরুষ মাসুলের জীবনের আদর্শ। এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।

মহানবি (স) তার ভাষণ শেষ করলেন। তাঁর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “হে আশ্রাহ, আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌতে দিতে পেরেছি?”

আরাফাতের মরদান থেকে লক লক কর্তৃ ধর্মিত হল, “হ্যা, আপনি পেরেছেন।”

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)- এর মন কখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তাঁর মনে হলো, হযরত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ। হযরত তিনি আর কাবাশরিকে উপস্থিত হতে পারবেন না। সমবেত মানুষের উদ্দেশে তিনি বললেন, “তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি। বিদায়।”



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

হিজরি হজ মহানবি কাবাশরিফ আরাফাত ভাষণ বান্দা আমির
উপাসনা ক্রীতদাস যিলকাদ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আরাফাতক্রীতদাসকাবাশরিফমহানবিহিজরিহজ

ক. দশম হজের সময় এসে গেল।

খ. তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে পালন করবেন।

গ. হ্যরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

ঘ. যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য
এলেন।

ঙ. ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কঞ্চি ধ্বনিত হল, ‘হ্যাঁ, আপনি প্রেরেছেন।’

চ. কোনো যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?

খ. আরাফাত-ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজির (স) মনের অবস্থা কেমন
হয়েছিল?

গ. মহানবি (স) তাঁর ভাষণে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?

ঘ. ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) কী উপদেশ দিয়েছেন?

ঙ. কোন চারটি কথা নবিজি (স) বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?

চ. তিনি আমাদের কাছে কোন দুইটি জিনিস রেখে গেছেন?

৪. টিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বিদায় হজ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

১. মদিনায়

২. মক্কায়

৩. আরাফাতের ময়দানে

৪. জেদ্দায়

- খ. আরাফাতের ময়দানে কত লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন?
১. প্রায় এক লক্ষ
 ২. প্রায় দুই লক্ষ
 ৩. প্রায় তিন লক্ষ
 ৪. প্রায় চার লক্ষ
- গ. হ্যরত মুহাম্মদ (স) কাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন?
১. সৈন্যদের
 ২. সাহাবিদের
 ৩. আলেমদের
 ৪. ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের
- ঘ. মহানবি (স) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন?
১. দুইটি
 ২. চারটি
 ৩. ছয়টি
 ৪. আটটি
- ঙ. মহানবির (স) ঢোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন?
১. মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য
 ২. মক্কা জয়ের আনন্দে
 ৩. সাহাবিদের নিয়ে হজ পালন করতে পারায়
 ৪. বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে

৫. নিচের বাক্যগুলো এককথায় প্রকাশ করি।

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| যার তুলনা হয় না | — | অতুলনীয় |
| যার শত্রু জন্মায় নি | — | অজ্ঞাতশত্রু |
| আকাশে যে উড়ে বেড়ায় | — | খেচর |
| বিদেশে থাকে যে | — | প্রবাসী |
| যা কষ্টে লাভ করা যায় | — | দুর্লভ |
| যা জলে চরে | — | জলচর |

৬. বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।

| বিরামচিহ্নের নাম | চিহ্নের আকৃতি |
|------------------|---------------|
| কমা | , |
| সেমিকোলন | ; |
| দাঁড়ি | |
| জিজ্ঞাসা-চিহ্ন | ? |
| বিশ্বায়-চিহ্ন | ! |

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই :

এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে নবিজির (স) মন আনন্দে ভরে গেল এত মানুষ এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাঁর মনে হলো হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

‘বিদায় হজ’ গল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লিখ।

দেখে এলাম নায়াগ্রা

তোমরা নিশ্চয়ই জলপ্রপাতের কথা শুনেছ? জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি। সেখানকার খুব বড় শহর টরন্টোতে। একদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গঞ্জের মজলিসে কথা উঠল-সবাই মিলে নায়াগ্রা দেখতে গেলে কেমন হয়। তখনি সকলে রাজি। কোনদিন যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো।

কোথাও যাব বললেই তো হয় না, কীভাবে যাব তা ভাবতে হয়। বাসে করে যাওয়া যায়। কিন্তু বাসে চেপে গেলে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে থামা যায় না। অতএব ঠিক হলো যে, কোনো বন্ধুর একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে।



তাই যাওয়া গেল একদিন। আমেরিকায় কিংবা কানাডায় প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি থাকে। আমার বন্ধুরও ছিল। বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা। আহ, দেশে ফিরে গিয়ে কী গঞ্জটাই না করা যাবে!

শী শী করে গাড়ি ছুটতে লাগল। এখানে রাস্তা মোটেই আঁকা বাঁকা থাকে না, রেসলাইনের মতো সোজা। ফলে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।



কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়াও দেখতেই যেতে হবে কেন? নায়াও হলো জলপ্রপাত। জলপ্রপাত তো কখনো দেখি নি। শুধু জেনে এসেছি, ঝর্ণার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে পানি নিচে সমতল ভূমিতে গাঢ়িয়ে পড়ে। তবে আকারে অনেক বিশাল। ঝর্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড়— এটুকু যা তফাত। উপর থেকে নিচে জল পতনের ব্যাপার দুই জায়গাতেই ঘটছে। জল যদি না-ই পড়ে, তা হলে ঝর্ণাও হবে না, জলপ্রপাতও হবে না। কিন্তু জল যে নিচে পড়ছে, পড়ে যাচ্ছে কোথায়? জলের ধর্ম তো গড়িয়ে যাওয়া। ঝর্ণার জলও গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।

এখন অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে যাব, কিন্তু পাহাড় দেখব না- একি কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ পাহাড় বেয়ে জলের নিচে নামাটা না দেখে উপায় তো নেই।

কিন্তু বিশ্ব-ভূমঙ্গল বড়ই বিচ্ছিন্ন। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রামে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি।

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্নেতা নদী বইছে। সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই? কিছুই তো ভাসছে না! তার কারণ, যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্নেতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাতে করেই এক বিশাল ফাটল। দুই দিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রাম জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। কিন্তু পানিটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কোথায়?

নায়াগ্রাম তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কানাডা দ্রুতগতিতে পতন সমতল ভূমি প্রবাহিত হওয়া গহ্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানাডা দ্রুতগতিতে পতন সমতল ভূমিতে প্রবাহিত গহ্বর

ক. হোঁচট খেলে ঠেকানো দায়।

খ. নদীর জল হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।

গ. পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা বলি।

ঘ. আমরা ইঁটতে পারি।

ঙ. একটি বড় দেশ।

চ. ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে, কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সে রকম নয়।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

- ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?
- খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?
- গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?
- ঘ. নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?
- ঙ. ‘বিশ্ব-ভূমঙ্গল বড়ই বিচ্ছি’ – ব্যাখ্যা কর।
- চ. সাধারণ জলপ্রপাতের সঙ্গে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

- ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

- | | |
|------------|------------|
| ১. জাপান | ২. ভারত |
| ৩. কানাড়া | ৪. রাশিয়া |



- খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে-

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ১. পাহাড় থেকে | ২. সমতল ভূমি থেকে |
| ৩. কোন উচু স্থান থেকে | ৪. পাহাড় ঢল থেকে |

- গ. জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ১. বাসের ভাড়া বেশি | ২. সেখানে বাস যায় না |
| ৩. বাসে ইচ্ছেমতো ধামা যায় না | ৪. বাসে সময় বেশি লাগে |

৫. তান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. তখন আমিও পড়েছি জলপ্রপাতের কথা।

সৌভাগ্য

খ. জলপ্রপাত দেখার একবার হয়েছিল।

ফাটল

গ. একদিন সঙ্গে গঞ্জের মজলিসে কথা উঠলো।

খরচ্ছোত্তা

ঘ. যে মাটির ওপর দিয়ে এই নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে

নায়াগ্রা

সেখানে হঠাতে করেই এক বিশাল.....।

বন্ধুবান্ধবদের

৬. কথাগুলো বুঝে নিই।

- জলপ্রপাত – পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া।
- মজলিস – গঞ্জগুজব করার আসর।
- জলের ধর্ম – জলের স্বভাব, জলের চরিত্র।
- বিশ্ব-ভূমণ্ডল – জগৎ, দুনিয়া।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

আমি কোথায় কোথায় বেড়াতে বা ঘুরতে গিয়েছি- তা মনে করার চেষ্টা করি। এর মধ্য থেকে যেকোনো একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে ব্যবহুর কাছে চিঠি লিখি (কোথায় গিয়েছিলাম, কবে গিয়েছিলাম, কীভাবে গিয়েছিলাম, কী কী দেখেছিলাম, কী করেছিলাম, কী খেয়েছিলাম, কেমন করে ফিরে এসেছিলাম)।

৮. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচ্চিরি। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রামে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি। সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্নোতা নদী বইছে। যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্নোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাতে করেই এক বিশাল ফাটল। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রাম জল এই ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

ক. পৃথিবীর বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

ঘ. নায়াগ্রামে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?



ରୌଦ୍ର ଲେଖେ ଜୟ

ଶାମସୁର ରାହମାନ

ବର୍ଷି ଏଳୋ ଥାଜଳା ନିତେ,
ମାରଲ ମାନୁଷ କତ ।
ପୁଡ଼ଳ ଶହର, ପୁଡ଼ଳ ଶ୍ୟାମଳ
ଗ୍ରାମ ଯେ ଶତ ଶତ ।

ହାନାଦାରେର ସଙ୍ଗେ ଜୋରେ
ଲଡ଼େ ମୁକ୍ତିସେନା,
ତାଦେର କଥା ଦେଶର ମାନୁଷ
କଥନୋ ଭୂଲବେ ନା ।

ଆବାର ଦେଖି ନୀଳ ଆକାଶେ
ପାଯରା ମେଲେ ପାଥା;
ମା ହେଁୟ ସାଯ ଦେଶର ମାଟି,
ତାର ବୁକେତେଇ ଥାକା ।

କାଳ ଯେଥାନେ ଆଧାର ଛିଲ
ଆଜ ସେଥାନେ ଆଲୋ ।
କାଳ ଯେଥାନେ ମନ୍ଦ ଛିଲ,
ଆଜ ସେଥାନେ ଭାଲୋ ।

କାଳ ଯେଥାନେ ପରାଜ୍ୟେର
କାଳୋ ସମ୍ଭ୍ୟା ହୟ,
ଆଜ ସେଥାନେ ନତୁନ କରେ
ରୌଦ୍ର ଲେଖେ ଜୟ ।



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জ্ঞেনে নিই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। এই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংগ্রাম করেছিল সে কথাও বলা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বর্গি হানাদার খাজনা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হানাদারদের বর্গি খাজনা

ক. সরকারকে দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য।

খ. বহু পূর্বে বাংলায় এসে হানা দিত, মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করত।

গ. পরাজিত করেই মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. বর্গি এলো খাজনা নিতে,
মারল মানুষ কত।

‘খাজনা নিতে’ অর্থ লুটত্তরাজ করত। বর্গিরা বাংলাদেশে এসে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বাঙালির ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেত।

খ. তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না, কারণ তাঁরাই হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন।

গ. মা হয়ে যায় দেশের মাটি,
তার বুকেতেই থাকা।

মা ও মাতৃভূমি সমান গর্বের, সমান আনন্দের। জননীহীন সন্তান যেমন দুর্ভাগা, যার মাতৃভূমি নেই সেও তেমনি ভাগ্যহীন।

৫. প্রশ়ঙ্গুলোর উভয় মুখে মুখে বলি ও লিখি।

- ক. বর্ণি কারা? তারা কী করেছিল?
- খ. হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?
- গ. মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?
- ঘ. মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে ঘূর্ষ করেছিল এবং কেন?
- ঙ. ‘কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।’— কথাটি ব্যাখ্যা করি।



৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

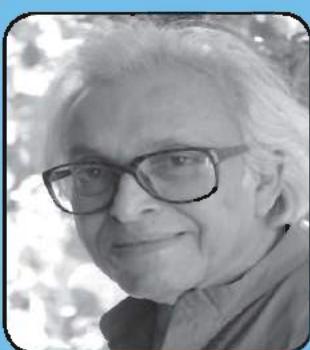
| | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|------|------|------|-----|--------|------|----------|
| আঁধার | আলো | কালো | সাদা | ভালো | মন্দ | জয় | পরাজয় | সকাল | সন্ধিয়া |
|-------|-----|------|------|------|------|-----|--------|------|----------|

- ক. বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজ দলের দেখে ছেলেটি আনন্দে নেচে উঠলো।
- খ. একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা ব্যাজ পরে শহিদ মিনারে যাই।
- গ. হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌছে যাব।
- ঘ. নামলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।
- ঙ. ছেলের সঙ্গ ত্যাগ করাই উভয়।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

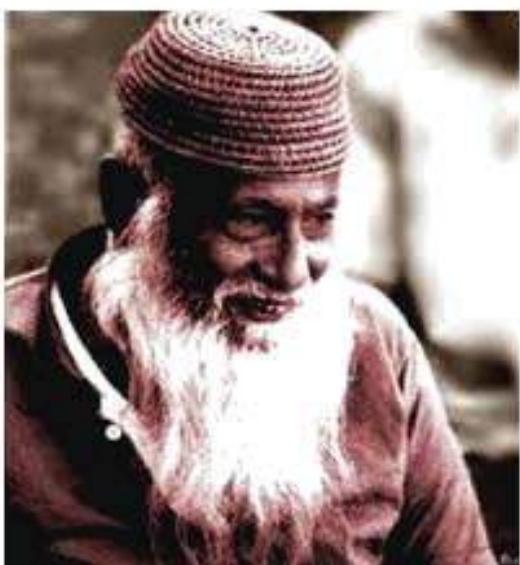


শামসুর রাহমান

কবি-পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবরে পুরানো ঢাকার যাহুতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংহী জেলার পাড়াতঙ্গী থামে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও মৃত্তিকথা লিখেছেন। ‘এলাটিং বেলাটিং’, ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো’, ‘মৃত্তির শহর ঢাকা’ ইত্যাদি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী



মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বালোর কৃষক মঙ্গল হামিদের অতি আগস্তস, মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। চিরকাল নির্বাচিত, নিপীঁফ্রিত মানুষের কাহাকাহি এসে দাঢ়িয়েছেন তিনি। মঙ্গলুম মানুষের সূর্য-দূর্ঘৰ্ষে কৌশে কীৰ্তি পিণ্ডের ভাসের কথা বলেছেন। সক্ষম করেছেন। এজন্য তিনি মঙ্গলুম অসমের।

সিরাজগঞ্জের খাসগঞ্জ প্রদেশের এক পরিশ্রেণি কৃষক পরিবার। এ পরিবারে আবদুল হামিদ খানের জন্ম হয় ১৮৮০ সালে। তাঁর বাবার নাম হাজী শরাফত আলী খান। মাঝের সাম মোসাম্বিক মাজিলে বিবি। অজ বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁর এক চাচা ইত্তাবীয় খান তাঁকে বৈশ্বরে আন্তর দেন। এই

চাচার কাছ থেকেই তিনি মাদরাসার পড়ালোনা করেন। এ সময় তিনি ইরাক থেকে আগত এক শীর সাহেবের স্নেহসূচি লাভ করেন। তিনি তাঁকে তারভের দেওবন্দ মাদরাসার পাঠিয়ে দেন। এ সময় তিনি দেশাব্দৰোধে উত্তুল হন।

মাদরাসার পড়া শেষ করে তিনি টাঙাইলের কালমালির এক প্রাইমারি ক্লে শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানে শিক্ষকতার সময় তিনি অমিদাঙ্গের অভ্যাচার, নির্বাচন মেথডে পান। এর বিদ্যুৎ প্রতিবাদ ও সক্ষম শুরু করেন। কলে অমিদাঙ্গের বিদ-সম্প্রদে পড়ে তাঁকে কালমালি ছাত্রকে কর।

বাইশ বছর বয়সে কল্পনা নেতা দেশবন্দু চিকিৎসন মাশের আদর্শে তিনি অনুপ্রাপ্তি হন। প্রেত তিনি গ্রাজনীতিতে সূজা হন। ধরণের অসহযোগ আলোচনে ঘোষ দেন। তাঁকে কালমালি করা হয়। সঙ্গের মাস পর তিনি মৃত্যু পান। এরপর ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে তিনি এক সত্তার তাবণ দেন। এই তাবণে তিনি কৃষক সাধারণের উপর অধিদারণের পোষণ, নিপীঁড়ন ও অভ্যাচাঙ্গের কাহিনি ক্লে থেকেন। এই সত্তার তাবণের অন্য তাঁকে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ছাড়তে হয়। তিনি ধরান চলে বান আসামের অলোচনে। এ কল্পনাই আসামের দুর্বত্তি জেলার ভাসানচৰে তিনি এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবকশের আত্মাজন করেন। এ সত্তার তিনি বাড়াগি কৃষকদের উপর অভ্যাচাঙ্গের হৃক্ষিত্য প্রতিবাদ জানান। এই সমাবকশেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে ভাসানচৰের মঙ্গলামা সাম

দেয়। পরে তাকে ভাসানী নাম দেয়। তখন খেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী এদেশে একটি প্রিয় নাম।

মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, ‘আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি। এই মানুষেরা কাজ করে খেতে-খামারে, কাজ করে কলে-কারখানায়। এরা কৃষক, এরা শ্রমিক। আর এরাই জমিদার, মহাজন, মালিকের জুলুমের শিকার হয়।’

মূলত সারা জীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্যই সঞ্চাম করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি আসাম থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বাস করতে শুরু করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি আবার গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন ‘কাগমারি সম্মেলন’ নামে খ্যাত। সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বন্ধনের চিত্র তুলে ধরেন।

মওলানা ভাসানী বুবাতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে তিনি পটন ময়দানে ভাষণ দেন। এই ভাষণে শোষণের এই কথাটিই বারবার উচ্চারণ

করে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন— পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে, এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে।



মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পটন ময়দানে ভাষণ দেন



মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৭১ সালের ২৫ এ মার্চ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যায়জ্ঞ শুরু হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ভারতে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি

স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার পরও কোনো পদব্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পালন করেন।

মওলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেন নি। কিন্তু এ দেশের মানুষের শিক্ষা প্রসারে তাঁর অনেক অবদান ছিল। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ। তাঁর জীবনচরণ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার। এরকম অনাড়ুন্ডের জীবনযাপন খুব কম দেখা যায়।

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৯৬ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটে। তাঁকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে আমরা প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার শিক্ষা পাই। তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন এ দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্যাতিত নিপীড়িত মঙ্গলুম বিষ-নজর কারাবুদ্ধ প্রতিবাদী সমাবেশ^১
কাগমারি সম্মেলন প্রবাসী আত্মসমর্পণ মোহ অনাড়ম্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রবাসী আত্মসমর্পণ মোহ সরকার প্রতিবাদী

ক. যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ হয়ে উঠেছিল।

খ. আজ প্রায় বিশ বছর ধরে আনিস সাহেব

গ. ছাড়া দেশ চালানো মুশকিল।

ঘ. সৎপোকের ধনসম্পত্তির উপরে থাকে না।

ঙ. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর করে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. মঙ্গলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মঙ্গলুম জননেতা বলা হয়?

খ. মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?

গ. কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

ঘ. কীভাবে তার নাম মওলানা ভাসানী হলো?

ঙ. পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

চ. শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

ছ. মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মঙ্গলুম কারাবুদ্ধ প্রতিবাদ অনাড়ম্বর মোহ আত্মসমর্পণ নিপীড়িত

৫. জেনে নেই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ- ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান নেতা। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮৭০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মুঙ্গীগঞ্জ জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সম্পাদক। এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সম্মুতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় নেতা। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে শুধু জানান।

৬. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মওলানা তাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঢ়িয়েছেন?

- | | |
|--------------|------------|
| ১. নির্ধাতিত | ২. অবহেলিত |
| ৩. সুখী | ৪. বড়লোক |

খ. মওলানা তাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. ইরাকের | ২. বাংলাদেশের |
| ৩. ভারতের | ৪. পাকিস্তানের |

গ. তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ১. গ্রামের মানুষের কারণে | ২. জমিদারদের কারণে |
| ৩. ব্যবসায়ীদের কারণে | ৪. রাজনৈতিক কারণে |

ঘ. মওলানা তাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন -

- | |
|------------------------------------|
| ১. আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি |
| ২. আমি আরামপিয় মানুষের কথা বলি |
| ৩. আমি সুখী মানুষের কথা বলি |
| ৪. আমি ভালো মানুষের কথা বলি |

ঙ. মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর
সঙ্গে গঠন করেন-

- | | |
|------------|------------|
| ১. যুক্তফল | ২. যুক্তদল |
| ৩. যুবদল | ৪. যুবফল |

চ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের কী ছিলেন ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. সদস্য | ২. প্রেসিডেন্ট |
| ৩. সহকারী | ৪. কেউ নন |

ছ. তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন ?

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | ২. দেশবন্ধু চিন্দ্ৰঘণ্টন দাশ |
| ৩. শেরে বাংলা ফজলুল হক | ৪. শেখ মুজিবুর রহমান |

৭. বাক্যের সাথে মিল করে ঠিক শব্দের উপর টিক (✓) টিক দিই।

ক. মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন—মওলানা
ভাসানী/শেরে বাংলা/ শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মওলানা ভাসানী কারাবুদ্ধ ইওয়ার পর মুক্তি পান—তেরো/ পনেরো/ সতেরো মাস পরে

গ. তাঁকে ভাসানী নাম দেয়—ভাসানচরের/ কাগমারীর/ ঢাকার সমাবেশের পর

ঘ. মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা—পুড়িয়ে দেয়/ পাহারা দেয়/
তাদের দখলে নিয়ে নেয়



শহিদ তিতুমীর

তেতো, তিতু, তিতুমীর। শুনতে বেশ অবাক লাগছে, তাই না? তা হলে খুশেই বলি।

১৭৮২ সাল। পশ্চিমবঙ্গের চকরিশ পরগনা জেলা। সে জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম চানপুর (মতাঙ্গরে হায়দারপুর)। এ গ্রামে বাস করত এক বনিয়াদি মুসলিম পরিবার। সৈয়দ বংশ। এই বংশে
জন্ম দেয় এক শিশু। ছোট শিশুটি ছিল যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বলিষ্ঠ তার গঢ়ন। শিশুটি ছিল
খুব জেদি। শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুব হলো। গ্রাম সামান্যের জন্য তাকে দেওয়া হলো
ভীষণ তেতো ওষুধ। এমন তেতো ওষুধ শিশু তো দূরের কথা বুঝেও মুখে নেবে না। অথচ এই
ছোট শিশু বেশ খুশিতেই খেল সে ওষুধ। প্রায় দশ-বারোদিন এই তেতো ওষুধ খেল সে। বাড়ির
লোকজন সবাই অবাক। এ কেমন শিশু, তেতো খেতে তার আনন্দ! এ জন্যে ওর ডাক নাম রাখা
হলো তেতো। তেতো থেকে তিতু। তার সাথে মীর লাগিয়ে হলো তিতুমীর। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ
মীর নিসার আলী।

তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। চলছে ব্রিটিশ
আঞ্চলিক। ইংরেজরা চালাত অত্যাচার। অন্তদিকে ছিল দেশি জমিদারদের জুলুম। ইংরেজ কর্মচারীরা
যোকা ছুটিয়ে চলত দারুণ দাপটে। তিতুমীর এসব দেখতেন আর ভাবতেন, এদের হাত থেকে
কীভাবে মুক্তি পাবে দেশের মানুষ।

তিতুমীরের গ্রামে ছিল একটি মাদরাসা। সেখানে শিক্ষক হিসেবে এলেন ধর্মপ্রাণ এক হাফেজ। নাম হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ। তিতুমীর এ মাদরাসায় পড়তেন। তিনি অল্প সময়েই হাফেজ নেয়ামত উল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

সেকালে গ্রামে গ্রামে ডনকুষ্টি আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো। শেখানো হতো মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর অসিচালনা। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানোর জন্য গায়ে শক্তি সঞ্চয় করা। তিনি ডনকুষ্টি শিখে কুষ্টিগির ও পালোয়ান হিসেবে নাম করলেন। লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর অসি পরিচালনাও শিখলেন। তাঁর অনেক ভক্তও জুটে গেল। তিতুমীরের গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি ছিলেন শাস্ত ও ধীর স্বভাবের।

একবার ওষ্ঠাদের সঙ্গে তিনি বিহার সফরে বেরোলেন। মানুষের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনে দেশকে স্বাধীন করবার চিন্তা এলো। তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে আহ্বান জানালেন। আর হিন্দুদের বললেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতে। হিন্দু-মুসলমান সকলে তাঁর কথায় সাড়া দিলেন।

১৮২২ সাল। তিতুমীরের বয়স তখন চাল্লিশ। তিনি হজ পালন করতে গেলেন মক্কায়। সেখানে পরিচয় হলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হ্যরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ এবং ধর্মপ্রাণ। তিতুমীর তাঁর শিষ্য হলেন। দেশে ফিরে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিলেন। ডাক দিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে, নৌকরদের বুখতে আর নিজেদের সংগঠিত হতে। কিন্তু প্রথম বাধা পেলেন জমিদারদের কাছ থেকে। তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু হলো। নিজ গ্রাম ছেড়ে তিনি গেলেন বারাসাতের নারকেলবাড়িয়ায়। নারকেলবাড়িয়ার লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন এক দুর্ভেদ্য বাঁশের দুর্গ। এটাই নারকেলবাড়িয়ার ‘বাঁশের কেল্লা’। তাঁর এ কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল চার-পাঁচ হাজার। চরিশ পরগনা, নদীয়া আর ফরিদপুর জেলা তখন তাঁর দখলে। ইংরেজদের কোনো কর্তৃত রইল না এসব অঞ্চলে। এ দুর্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের লড়াইয়ের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল ও প্রস্তুতি শেখাতে লাগলেন। এ খবর চলে গেল ইংরেজ শাসকদের কাছে। ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাল দেশি জমিদাররা। ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয় তিতুমীরকে দমন করবার জন্য। কিন্তু আলেকজান্ডার তাঁর সিপাহি বাতিলী নিয়ে পরাস্ত হন তিতুমীরের হাতে। তারপর তিতুমীর কয়েকটি নৌকুষ্টি দখল করে নেন।

১৮৩১ সালের ১৯এ নভেম্বর। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি পাঠালেন বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী। এর নেতৃত্ব দেওয়া হলো সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্টকে। স্টুয়ার্ট আক্রমণ করলেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তখন ভালো করে ভোর হয়নি। আবছা আলো। স্টুয়ার্টের ছিল হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য আর অজস্র গোলাবাবুদ। তিতুমীরের ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাজার স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক। তাঁর না ছিল কামান, না ছিল গোলাবাবুদ, বন্দুক। তবে তাঁদের মনে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার অমিত তেজ।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে গেল নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। শহিদ হলেন অসংখ্য মুক্তিকামী বীর সৈনিক। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল। কারো হলো কারাদণ্ড, কারো হলো ফাঁসি। এভাবেই শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহিদ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

জেদি পরাধীন দাপটে ডনকুষ্টি অসিচালনা দুর্ভেদ্য দুর্গ বাঁশের কেল্লা
শায়েস্তা অমিত তেজ মুক্তিকামী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

| | | | | | |
|--------|----------|----------|-------|-------|------------|
| পরাধীন | ডনকুষ্টি | অসিচালনা | দুর্গ | দাপটে | মুক্তিকামী |
|--------|----------|----------|-------|-------|------------|

- ক. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল ।
- খ. ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দাবুণ ।
- গ. তিনি লাঠিখেলা, তীর ছেঁড়া আর শিখলেন।
- ঘ. সেকালে গ্রামে গ্রামে আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো।
- ঙ. শহিদ হলেন অসংখ্য বীর সৈনিক।
- চ. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সংজ্ঞা নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বাঁশের ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. ‘তিতুমীর’ নামটি কেমন করে হলো? তাঁর প্রকৃত নাম কী?
- খ. এ দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার চিন্তা কেন তাঁর মনে এলো?
- গ. হিন্দু-মুসলমান সবাইকে তিনি কী বলে একতাবাদ করতে চাইলেন?
- ঘ. ইংরেজদের পাশাপাশি কারা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত?
- ঙ. নারকেলবাড়িয়া কোথায়? এখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন?
- চ. কত খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের কাছে ব্রিটিশ শক্তি পরাজিত হয়?
- ছ. কখন কোন ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়?
- জ. তিতুমীর কীভাবে শহিদ হলেন?
- ঘ. পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে?
- ঞ. শহিদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

বাঁশের কেল্লা জেদি সশস্ত্র শায়েস্টা প্রিয়পাত্র দুর্ভেদ্য

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

- ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
২. সৈয়দ ঝীর নিসার আলী
৩. মোঃ শামসুল হক
৪. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- খ. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ কাদের অধীন ছিল?

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. ফরাসিদের | ২. ডাচদের |
| ৩. ব্রিটিশদের | ৪. পর্তুগিজদের |

- গ. মকায় কোন সংগ্রামী পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাথে তিতুমীরের পরিচয় হয়েছিল?

১. হ্যরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে
২. হাফেজ নেয়ামত উল্লার সঙ্গে
৩. গোলাম মাসুদের সঙ্গে
৪. হ্যরত আলী (রা) এর সঙ্গে

৪. তিতুমীরের দুর্গের নাম কী?
১. লাঠির কেল্লা
 ২. লোহার কেল্লা
 ৩. বেতের কেল্লা
 ৪. বাঁশের কেল্লা
৫. তিতুমীর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পরাজিত করেন?
১. ১৮২২
 ২. ১৮৩০
 ৩. ১৮৩১
 ৪. ১৮৩৪
৬. তিতুমীর ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কেন?
১. তাঁর সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
 ২. প্রশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবে
 ৩. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে
 ৪. অদৃৰদর্শিতার কারণে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

| পরাধীন | স্বাধীন | বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। |
|--------|---------|----------------------------|
| তেজো | | |
| পরাস্ত | | |
| দুর্বল | | |
| আনন্দ | | |
| শান্ত | | |

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শহিদ তিতুমীরের ‘বাঁশের কেল্লা’ সম্পর্কে যা জান লিখি।

অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

বুমা আর বুবা দুই বোন। ওদের খুব ভাব। একসঙ্গে ক্লুলে যায়। একসঙ্গে খেলে। খুব কমই
ঝগড়া হয় ওদের।

বুমার বয়স বারো আর বুবার দশ।

দুই জনের জন্মদিন নিয়ে ওদের মা-বাবার এক একটি গল্প আছে। ওদের মা রাহেলা বলে,
যেদিন বুমার জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল
নাকি আর কখনো দেখে নি রাহেলা বানু। খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে।

বুবা উদগ্রীব হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

তোর গল্পটা আমি বলব, মা। এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। বলে, যেদিন তুই
হলি সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটার নিচে বসে আছি। হঠাতে মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি
আমের বোলে ভরে আছে গাছটা। এত বোল আসতে দেখি নি আগে। বোলের গম্ভীর চারদিক ভরে
গেছে।

দুই বোন মা-বাবার আদরের ছায়ায় বড় হয়। ক্লুলে যাওয়ার পথে বুনোফুল ছিড়ে বেণীর সঙ্গে
গেঁথে রাখে। ফড়িৎ ধরে। আবার আকাশে উড়িয়ে দেয়। ফুলের পাপড়ি ছিড়ে খাতার ভিতর চাপা
দিয়ে রাখে। শুকিয়ে গেলে বাবার কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু
হোক। মায়ের কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

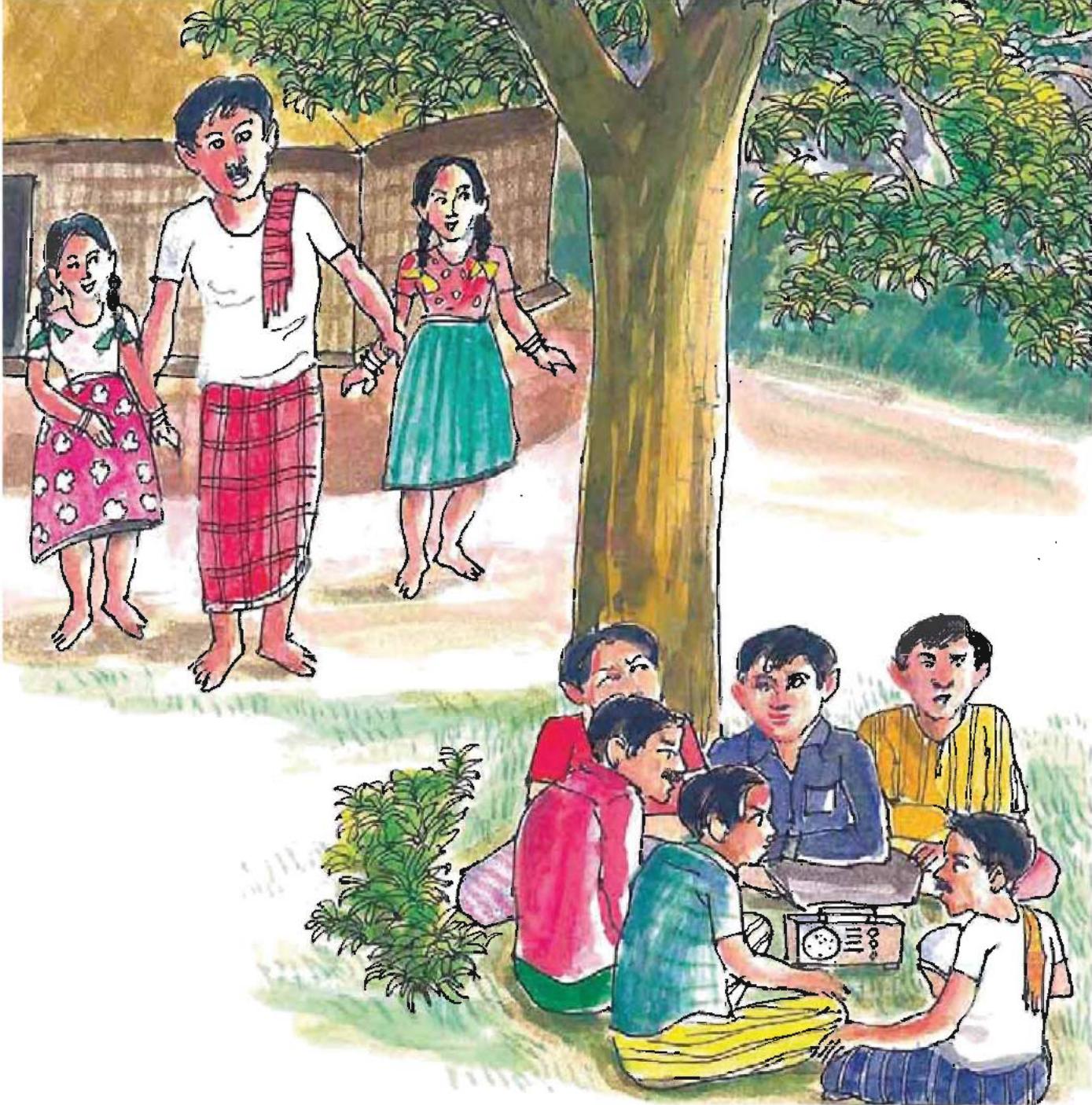
জসীম মিয়া ওদের কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ, মা।
চাইলে লেখাপড়ার জন্য তোদের আমি ঢাকা পাঠাব।

দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়। মা-বাবা ওদের উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন
জসীম মিয়া বাজারে যায়। সেখান থেকে দুই সের চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ধপাস
করে বসে পড়ে। ছুটে আসে রাহেলা বানু।

– কী হয়েছে?

– যুদ্ধ।

– যুদ্ধ? রাহেলা বানু অবাক হয়ে বলে।



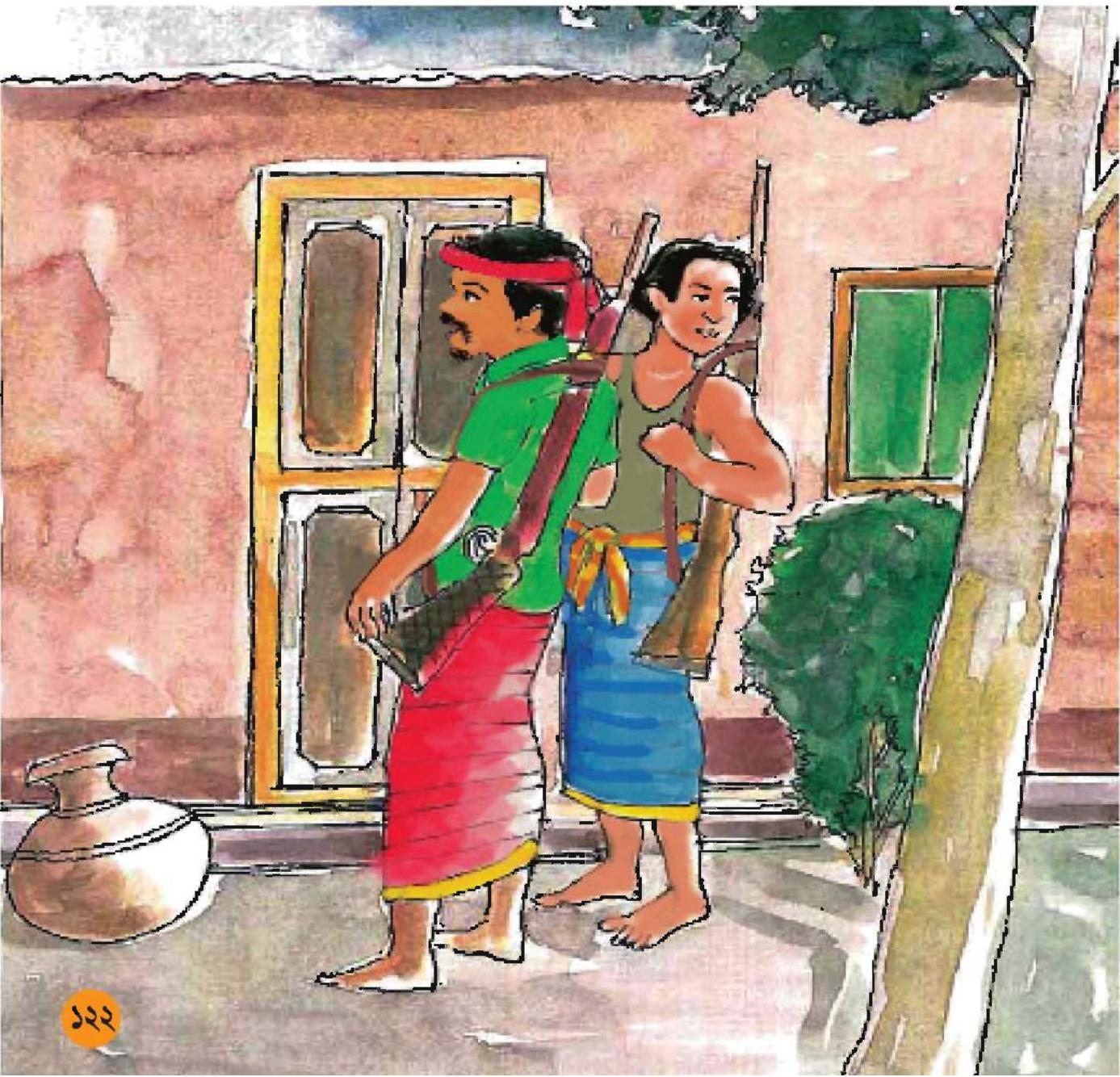
কিছু বলার আগেই জসীম শুনতে পায় বাইরে হইচই। ও দুই মেয়ের হাত ধরে বাইরে আসে। দেখে লোকজন আমগাছের নিচে গোল হয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছে। বিবিসির খবরে বলছে, ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে গণহত্যা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা বঙ্গাবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল—‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

লোকজন খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাদের সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে।

রূমা-রূবা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয়।
চিঠকার করে বলে, যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ।

কয়েকমাস পরে গায়ে মিলিটারি আসে। জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে রাইফেল
চালানো শিখে নেয়। তারপর গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। রাহেলা মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে থাকবে।
জসীম চেয়েছিল রাহেলা ওর বাবার বাড়ি চলে যাক, কিন্তু রাহেলা যেতে রাজি হয় নি।



নদীর ধারেই বাজার। সেদিন বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি মিলিটারির সামনে পড়ে যায় জসীম। ওরা বাজারের দোকান ও ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে। একটি বুলেট এসে লাগে জসীমের বুকে। নদীর ধারে মুখ পুরুড়ে পড়ে যায় ও। রক্তে ভেসে যায় মাটি। নিজেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর।

মিলিটারিরা চলে গেলে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আসে। রাহেলাও মেয়েদের নিয়ে আসে বাড়িতে। অনেক বাড়ি পুড়ে গেলেও ওদের বাড়িতে আগুন লাগে নি। বড় আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছে বলে আগুন এখানে আসতে পারে নি।

রাহেলা সারা রাত জসীমের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু জসীম বাড়ি ফেরে না। বুমা-বুবা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়।

পরদিন গাঁয়ের লোকেরা জসীমের লাশ নিয়ে আসে বাড়িতে। বুমা-বুবা কিছুক্ষণ বাবাকে দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেন ওরা কথা বলা ভুলে গেছে। রাহেলা তো বারবার জ্ঞান হারাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েরা ওদের মাকে দেখাশোনা করছে। দুই বোন রান্নাঘরের দরজায় চুপ করে বসে থাকে।

বুবা বুমার হাত ধরে ঝাকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু?

বুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে, বাবার মরে যাওয়া।

দুই জন আকাশের দিকে তাকায়। অনেক দূরে কালো ধোয়ার মতো কিছু একটা আকাশের দিকে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই।

ওরা বুবাতে পারে পাশের গ্রামে আগুন দিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারি।

দুই বোন আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুই জনেই বুবাতে পারে যুদ্ধ মানে কী!

ঘোর বর্ধা। বৃক্ষের তোড়ে ডুবে যায় মাঠঘাট। রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় বসে থাকে। দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুঁচো চিখড়ি ধরে আনে। ওদের মা অন্যের বাড়ি থেকে আনা চালে ভাত রান্না করে।

দু-মুঠো চাল মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে রাহেলা বানু। রাতে কোনো মুক্তিযোদ্ধা এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে। দুই বোন শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে জমিয়ে রাখে। যদি লাকড়ির দরকার হয় তখন কী দিয়ে ভাত রান্না করবে মা? দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে।

ইসে রাতে বৃক্ষ ছিল না। জ্যোৎস্নায় তরা ছিল উঠোন।

গতীর রাতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে।

চূপিচুপি ডাকে, মা দরজা খোল মাগো—

রুবা ধড়মড়িয়ে উঠে রুমাকে ডাকে। ও ঠেলে মাকে জাগায়।

— মা ওঠো। শোন, কেউ এসেছে। রাহেলা বানু দরজায় টুকটুক শব্দ শোনে। দরজার কাছে গেলে আবার শুনতে পায় সে ডাক, মা দরজা খোল।

রাহেলা কাঁপা হাতে দরজা খুললে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ওদের একজন বলে, ট্রেনিংয়ের সময় জসীম কাকু আমাদের বলেছিলেন দরকার হলে যেন আপনার কাছে আসি।

— মা, আপনি আমাদের চিনবেন না। আমাদের থিদে পেয়েছে। ভাত খেয়েই চলে যাব।

— কোথায় যাবে? রুমা জিজ্ঞেস করে।

— নদীর ওপারে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আছে।

— তোমরা যুদ্ধ করবে? রুবা জানতে চায়।

— হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করব।

— তোমাদের রাইফেলগুলো ছুঁয়ে দেখি? রুমা গতীর আবেগে বলে।

— হ্যাঁ, দেখ।

দুজনে দুবোনের কোলে রাইফেল দুটো দিয়ে দেয়। রাইফেল দুটো শুরা কোলে নিয়ে বসে থাকে। মা রান্না চড়ায়। কিছুক্ষণ পর রাহেলা গরম ভাত নিয়ে আসে গামলা ভরে। সঙ্গে ডিম-আলুর তরকারি। যোদ্ধা দুইজন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা। দেরি করা চলবে না। খাওয়া শেষ হলে রাহেলা বলে, তোমরা আবার আসবে তো?

দরকার হলে আসতে পারি। নইলে অন্যেরা আসবে। কেউ না কেউ আসবে।

রাহেলা বানুকে সালাম করে দুই বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা।

বৰ্ষা শেষ।

আশ্বিনের শিউলি ফোটার দিন শুরু হয়েছে। একদিন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়।

— খুকুমণিরা দরজা খোল।



দুই বোন লাফ দিয়ে উঠে দরজা খোলে। মুক্তিযোদ্ধারা আসে। ভাত খায়। নয়তো একটু ঘুমিয়ে
নেয়। রাতের অশ্঵কারে আবার চলে যায়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে চারদিকে।

বুমা আর বুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না।

ওরা আবার অপেক্ষা করে একটি ডাক শোনার জন্য,

— খুকুমণিরা দরজা খোল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

খুশবু উদগীব বিবিসি গণহত্যা বঙ্গবন্ধু ট্রেনিং গপগপিয়ে মুক্তিবাহিনী
মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প মিলিটারি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বঙ্গবন্ধুর মিলিটারির গণহত্যা উদগীব বিবিসির মুক্তিযোদ্ধারা

ক. বুবা হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

খ. সবাই আমগাছের নিচে বসে রেডিওতে খবর শুনছে।

গ. ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

ঘ. জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল।

ঙ. বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি সামনে পড়ে যায় জসীম।

চ. রাতে এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. বুমার জন্মদিনের গঞ্জটি কী?
- খ. বুবার জন্মদিনের গঞ্জটি কী?
- গ. রাহেলাবানু প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে দিত কেন?
- ঘ. গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?
- ঙ. মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।
- চ. “আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা।”—“অনেক বুদ্ধি” এবং “বড় হ”
বলতে তুমি কী বোঝ?
- ছ. একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ফুলের পাপড়ি ছিড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?

১. বইয়ের ভিতর
২. বালিশের নিচে
৩. কোটার ভিতর
৪. খাতার ভিতর

খ. আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?

১. বাজারের খবর
২. যুদ্ধের খবর
৩. গণহত্যার খবর
৪. বাড়ির খবর

গ. বুবা বুমার হাত ধরে ঝাকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? বুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে—

১. বাবার মরে যাওয়া
২. মায়ের মরে যাওয়া
৩. ভাই বোনের মরে যাওয়া
৪. স্বামী মরে যাওয়া

ঘ. কখন শিউলি ফুল ফোটে?

১. আশ্বিন মাসে
২. কার্তিক মাসে
৩. দিনের বেলা
৪. মাঘ মাসে

৫. শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সাজাই

এমন কিছু শব্দ আছে যা দিয়ে কারোর নাম, জায়গার নাম বোবায় সেগুলো বিশেষ্য। যেমন—
নদী শুকিয়ে গেছে। এখানে ‘নদী’ বিশেষ্য পদ। আবার এমন শব্দ আছে যা দিয়ে বিশেষ্য
শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোবায় সেগুলো বিশেষণ পদ। যেমন— মুনা
দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। এখানে ‘দ্রুত’ বিশেষণ পদ। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য
ও বিশেষণ পদ আলাদা করি।

গাছ, ভাত, শুকনো, ভীষণ, নদী, কাঁপা, দরজা, রাইফেল, গরম, গভীর, হাড়ি, দ্রুত।

| বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---------|--------|
| নদী | গরম |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

| | | |
|--------|--------|---|
| অন্ম | মৃত্যু | যুদ্ধের সময় দেশের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল। |
| কান্না | | |
| তরা | | |
| যুদ্ধ | | |
| দূর | | |
| শুকনো | | |

৭. বাক্য রচনা করি।

জন্মদিন আয়ু অপেক্ষা মুক্তিযোদ্ধা রেডিও

৮. কথাগুলো বুঝে নিই।

ধপাস করে পড়া – হঠাতে ধপ করে পড়া। ট্রাক থেকে চালের বস্তাটি ধপাস করে পড়ে গেল।

মুখ খুবড়ে পড়া – উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া। ছেলেটা হোচ্ট খেয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল।

গপগপিয়ে খাওয়া – একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুরে দ্রুত খাওয়া। সে গপগপিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলল।

দুই সের – আমাদের দেশে আগে ওজন মাপের জন্য ‘সের’ ব্যবহার করা হতো।

১ সের পরিমাণ বর্তমান মাপে ১ কেজির কিছু কম (প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)।

১ কেজি = ১.০৭ সের (প্রায়)

৯. কর্ম-অনুশীলন।

আমার শ্রেণিশিক্ষক, মা-বাবা, দাদা-দাদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে তা লিখি ও শ্রেণির সহপাঠীদের পড়ে শোনাই।



সেলিনা হোসেন

লেখক-পরিচিতি

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি ১৪ই জুন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা একাডেমিতে পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ‘সাগর’, ‘গল্পে বর্ণমালা’, ‘কাকতাড়ুয়া’, ‘চাঁদের বুড়ির পাঞ্জা ইলিশ’ ইত্যাদি তাঁর লেখা শিশু-কিশোর উপযোগী বই। তিনি সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ২০০৯ সালে ‘একৃশে পদক’ লাভ করেন। ২০১০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বশিকাতা থেকে তিনি ডিগ্রি উপাধি পান। ২০১১ সালে দিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রেমচান্দ ফেলোশিপ পান।

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ

অর্থ

অ

অচিনপুর
অবধারিত
অবরুদ্ধ
অহকোর
অপার
অনাড়ম্বর
অমিত তেজ
অভিভূত
অসিচালনা
অমূল্য

- অচেনা স্থান।
- অনিবার্য, যা হবেই, নির্ধারিত।
- শত্রু দিয়ে বেঠিত, কষী।
- নিজে অনেক বড় কেউ – এরকম মনে করা।
- অগাধ, অসীম।
- সাদাসিথা।
- অসীম সাহস আর অদম্য শক্তি।
- ভাবাবিক্ত বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়।
- তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার বিদ্যা।
- যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

আ

আসন্ন
আচ্ছাদন
আআদানকারী
আআসমপৰ্ণ
আনকোরা
আস্থানা
আফেটপৃষ্ঠে
আরাফাত
আমির

- নিকট।
- ঢাকনি, ছাউনি।
- নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যিনি।
- সম্পূর্ণরূপে অন্যের বশ্যতা সীকার।
- নতুন।
- বসবাসের জায়গা।
- সর্বাঙ্গে, সারা শরীরে।
- মক্কা থেকে প্রায় বারো মাইল পূর্বে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ময়দান।
- বড়লোক; ধনী; সম্পদশালী সন্ধান মুসলমান; মুসলমান শাসকের উপাধি

ই

ইঙ্গিত

- ইশারা।

উ

উদ্ঘাটীব
উপত্যকা

- প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করা, খুব আগুছী, ব্যগ্র।
- দুই পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি
অথবা পাহাড়-পর্বতের পাশের ভূমি।
- নদী ও সাগরের ঢেউ।
- ঢেউসমূহ, ঢেউগুলো।
- এবাদত; আরাধনা; আল্লাহর ধ্যান।

উ

উর্মিমালা
উপাসনা

- (Final Arts) আজকের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার সমতুল্য।
- পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

এ

এক্ষণেরিমেন্ট

- যৌবা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন। ইতিহাসে স্থান সাতের যোগ্য বা
ইতিহাস-ভিত্তিক হলেও তাকে ঐতিহাসিক বলা হয়।

ঐ

ঐতিহাসিক

- যে কাহিনি কলনা করে লেখা হয়। এক প্রকার কলকাহিনি আছে যা
বিজ্ঞানকে প্রধান করে লেখা হয়, তাকে কলা হয় বৈজ্ঞানিক কলকাহিনি।

ক

কলকাহিনি

- উন্নর আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশ।

কানাডা

- জেলখানা বা কারাগারে আটক রাখা।

কারাবুদ্ধ

- মকায় অবস্থিত বিখ্যাত আল্লাহর ঘর।

কাবাশরিফ

- এক ধরনের ছেট সাদা বিনুক।

কড়ি

- পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ।

কিটির মিটির

- আলো।

কিরণ

- কেনা পোলায়; মূল্য দিয়ে যে ভূতকে যাবজ্জীবনের জন্য কেনা হয়েছে।

ক্ষীতদাস

- কুমার

| | | |
|-----------|--|--|
| ক | কর্নিশ কীকন কোলাহলকল | <ul style="list-style-type: none"> - মাথা নত করে অভিবাদন করা। - হাতে পরার গহনা। - কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল। আর ‘কল’ বলতে বোবায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে এক সঙ্গে গোল-গোল চিৎকার করলে বেশ ভালো শোনায় বলে ‘কোলাহলকল’ বলা হয়েছে। - সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঝাঁটি। সেনাহাউজনি। |
| খ | খাজনা খাটিয়া পুশ্প শ্রিষ্টপূর্ব | <ul style="list-style-type: none"> - কর বা ট্যাঙ। - কাঠের তৈরি খাট। - সৃগুৰু - যিশুচ্রিয়ের জন্মের পূর্বের বৎসর বোবাতে বলা হয় শ্রিষ্টপূর্ব, আর তার জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় শ্রিষ্টাব্দ। |
| ঙ | ঙুত | <ul style="list-style-type: none"> - শরীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান। |
| গ | গগগপিয়ে গণহত্যা গহৰ গর্জে উঠা গৰ্দন গিরিডি | <ul style="list-style-type: none"> - গগগপ করে। - অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা। - গর্জ। - ঝুঁকার দিয়ে উঠা। - ঘাঢ়, গলা। - ভারতের ঝাড়খন রাজ্য অবস্থিত। এটি শিরিডিত্ত জেলার একটি প্রধান শহর। ১৮৭২ সালের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল। - গৃহস্থ, সৎসনীয় লোক। গেরস্ত লোকের বহু কাঙ্কর্ম থাকে। |
| গে | গেরস্ত | <ul style="list-style-type: none"> - অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর। |
| ঘ | ঘোৱ | <ul style="list-style-type: none"> - ইসজাতীয় পাখি। |
| চ | চকাচকি চন্দ্ৰলোক চৰণ চিনচিন | <ul style="list-style-type: none"> - চান্দের দেশ। - পা। - অৱ অৱ ব্যথা বা জ্বালা বোবায় এমন শব্দ। |
| জ | জগৎ^১ জনপদ জেদি | <ul style="list-style-type: none"> - পৃথিবী। - যেখানে অনেক মানুষ এক সাথে বসবাস করে, লোকলয়, শহর। - একগুয়ে, কোনো কাজ করতে যে নাহোড়বাদা। |
| ট | টেন্টন চৰস টেপা পুতুল | <ul style="list-style-type: none"> - যন্ত্রণা বোবায় এমন অনুভূতি। - পাহারা দেওয়া। - কুমাররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত-পা বা জোড়গুলো একটু ডিজে ডিজে মাটি দিয়ে যত্ন করে লাগাতে হয়। - ‘টেৱা’ অর্থ মাটি, আর ‘কোটা’ অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেৱাকোটা হিসেবে পরিচিত। - গাঢ়, সুন্দর। - কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া। |
| টে | টেৱাকোটা | <ul style="list-style-type: none"> - বুকড়ন দিয়ে শরীরচর্চা আর শারীরিক শক্তির পরীক্ষা। - একধরনের লৌক। - এটা ফুটবল খেলার একটা কোশল। ইংরেজি dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কোশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া। |
| ড | ডুকুটুক ডেনিং ড | <ul style="list-style-type: none"> - ডনকুস্তি - ডিপ্তি - ড্রিবলিং |

ত

তট
তটস্থ
তারারা
তিরিক্তি
তুলকালাম কাণ্ড
তেক্টা

- নদীর তীর।
- ব্যতিব্যস্ত।
- আকাশের তারকারাঙ্গি।
- ধারাপ মেজাজ।
- এলাহি কাণ্ড।
- তৃক্ষণা, পিপাসা। তেক্টায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

দ

দাপটে
দূর্গ
দুর্ভেদ্য
দৃঃসাহসী
দিগন্ত
দৃত গতিতে
দেশান্তর
দেলাই মাথা

- প্রবল প্রতাপের সঙ্গে।
- প্রাচীর বা দেয়াল ঘেরা সেনানিবাস।
- যা কষ্টে ভেদ করা যায়।
- অত্যধিক সাহস আছে এমন।
- প্রাস্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।
- খুব তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া।
- অন্য দেশ।
- মাথা নাড়াই।
- পৃথিবী।

ধ

ধরা

ন
নকশা

নিশ্চিরাত
নির্জন
নিদর্শন
নির্বিচারে
নির্যাতিত

- রেখা দিয়ে আকা ছবি। শব্দের ইঁড়ি, টেপা পুতুল বা পশুগাথির গায়ে গ্রামের কুমার শিল্পীরা নানা রঙের ছবি আঁকেন। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।
- গভীর রাত্রি। মাঝ রাত।
- জনশূন্য স্থান।
- প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
- কোনো রকম বিচার বিবেচনা ছাড়া।
- অন্যায়ের শিকার, নিপীড়িত।

প

পতন
পরস্পর
পরাধীন
পল্লবা
পাটি
পর্যবেক্ষণ
পাখপাথলি
পার্কড
পার্টিত্যপূর্ণ
শুটলি
প্রকৃতি
প্রাচীনতম
প্রাতঃর
প্রতিবাদী
প্রতিধ্বনি
প্রবাসী
প্রবাহিত হওয়া
প্রবেশিকা/প্রবেশিকা পরীক্ষা

- পড়ে যাওয়া।
- একের সঙ্গে অন্যের।
- পরের অধীন, আধীন নয়।
- পথ।
- কাপড়ের লস্বা ঢুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাধা থাকে।
- কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।
- নানা ধরনের পাথি।
- নির্দয়।
- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ।
- বৌঁচকা।
- নিসর্গ।
- প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে তম যোগ করা হয়।
- মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ ভূমি।
- যে কোনো উক্তির বিবুল্যে যারা আপাতি জ্ঞানায়।
- বাতাসে ধাক্কায় ধানির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।
- ভিন্নদেশে যে বাস করে।
- বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।
- আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। প্রবেশিকা পাস করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত। তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।
- প্রত্ব শব্দের অর্থ অতি পূর্বান। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বলা হয় প্রত্বতত্ত্ব। তবে, প্রাচীন কালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অটোলিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় বা যেতাবে বের করা হয় তাকে বলে প্রত্বতত্ত্বিক।
- উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে বেগে পতন।
- ধোওয়া, পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

କ

ଫରମାଯେସ
ଫୂରସତ
ଫେରିଆସା
ଫେଡ୍ରେ
ଫୋଟେ

- ହୁକୁମ, ଆଦେଶ ।
- ଅବସର, ଅବକାଶ, ଛୁଟି ।
- ରାସ୍ତାଯ ବା ବାଡ଼ିତେ ବାଡ଼ିତେ ଘୁରେ ଯାଇବା ଜିନିସପତ୍ର ବିକିଳ କରେନ ।
- ଛିଡ୍ରେ ।
- ପର୍ମ୍ୟୁଟିଟ ହୟ, ଫୁଟେ ଓଠେ ।

ବ

ବରଣ
ବରକଦାଜ
ବଞ୍ଚ
ବନ୍ଦ
ବଞ୍ଚବନ୍ଧୁ
ବର୍ଗ
ବରେଣ୍ୟ
ବାହାର
ବାରି
ବାନ୍ଦା
ବିଜୁ
ବିଜୟନ୍ତ୍ର
ବିବିସି
ବିଲୁଷ୍ଟ
ବିଆଦ
ବିସ-ନଜର
ବେଳୋଭୂମି
ବେଳବଳ
ବୈଚିତ୍ର୍ୟ
ବାଁଶେର କେଳ୍ପା

- ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ ।
- ବନ୍ଦୁକଧାରୀ ସିପାଇ ବା ରଙ୍କୀ ।
- ଭୀଷଣ ଶର୍ପ କରେ ଘଡ଼େର ଆକାଶେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଓଯା, ବାଜ ।
- ବନ୍ଧ ।
- ଜ୍ଞାତିର ଜଳକ ଶେଷ ମୁଜିବୁର ରହମାନେର ଉପାଧି ।
- ମାରାଠା ଦସ୍ୟ ।
- ମାନ୍ୟ ।
- ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ।
- ପାନି । (ଶର୍ଦ୍ଦିତ ଶୁଦ୍ଧ କବିତାଯ ବ୍ୟବହୃତ ହୟ ।)
- ଗୋଲାମ; ଦାସ; ଏକାନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ।
- ଚାକମାଦେର ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ।
- କୋନୋ କିଛି ଜୟ କରାର ପର ଯେ କୃତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରା ହୟ ।
- ଯୁକ୍ତରାଜୋର ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରେ ନାମ ।
- ଯା ଲୋପ ପୋଯେଛେ ।
- ଖେତେ ମଜା ନନ୍ଦ ଏମନ ।
- ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତି, କୁଳଜର ।
- ସମୁଦ୍ରର ତୌରେ ବାଲୁଯ ସ୍ଥାନ ।
- ସୀଶବାଗାନ ।
- ବିଭିନ୍ନତା ।
- ବାଁଶ ଦିଯେ ତୈରି କେଳ୍ପା ବା ଦୂର୍ଗ ।

ତ

ଭୟଜକର
ଭାସଣ

- ଭୀଷଣ, ଭୀତିଜଳକ, ଅଭ୍ୟତ ।
- ବକ୍ରତା, ବିବୃତି, ଉତ୍କି ।

ମ

ମହାନବି

- ଆଲ୍ଲାହର ପଯଗମ୍ବର; ରାସୁଲ; ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଦେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିନି । ଶେ ନବି ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ)-କେ ମହାନବି ହିସେବେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରା ହୟ ।

ମଜ୍ଜମୁତ୍

ମହାନ

ମନ୍ଦୀ

ମହାକଳରବ

- ଅଭ୍ୟାସିରିତ, ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହ୍ୟ, ଉଦାର ।
- ଉଦାରମନ୍ତା ।

ମରଣ—ସ୍ଵର୍ଗା

ମାରାବତୀ

ମାଲିଶ

ମିଳିଟାରି

ମୁକ୍ତିକାମୀ

ମୁକ୍ତିବାହିନୀ

ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା

ମୃତ୍ତ

ମେଦିନୀ

ମୋହ

ମୃତ୍ୟିଶିଳ

- ମୃତ୍ୟୁ କରୁଥିଲ ଥେକେ ଦେଶକେ ରଙ୍କା କରାର ଅନ୍ୟ ଲଡ଼ାଇ କରେଛିଲ ଯେ ସେନାଦଳ ।
- ଯିନି ଶାଧୀନତା ବା ମୁକ୍ତିର ଜଳ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରେନ ।

ସ

ସମ୍ମାନୀ

ସିଲକାଦ

ସୁଗାନ୍ତର

- ବିଦ୍ୟାତ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ।
- ଆରବି ବହୁରେ ଏକଟି ମାସେର ନାମ ।
- ଅନ୍ୟୁଗ ବା ସମୟ ।

ର

ରଯେଶ
ରକ୍ତରଙ୍ଗିତ
ରକ୍ଷୀ
ରାଜପ୍ରାସାଦ
ରୁକ୍ଷମୂର୍ତ୍ତି

ଲ

ଲବେଜାନ

ଶ

ଶଖ
ଶବେର ହାଡ଼ି

ଶକ୍ତିଧର
ଶକ୍ତିକତ
ଶଦ୍ଦୂସଣ
ଶାଳବନ ବିହାର

ଶାହାନଶାହ
ଶାହଜହାନ
ଶାଯିତ
ଶାଯେସ୍ତା
ଶିର
ଶିର୍ଲୀ

ସ

ସଂକଳ
ସରକାର
ସମତଳ ଭୂମି
ସମସ୍ୟାରେ
ସମ୍ବେଦନ
ସମାବେଶ
ସାର୍ଥକ
ସାଂଖ୍ୟୀ
ସିଦ୍ଧୁ
ସେର
ମେହ-କପା
ଆଦ
ସ୍ଵଜନ
ସ୍ଵର୍ଗତା

ସୌଭାଗ୍ୟ
ସଞ୍ଚାର
ସ୍ନୋତସ୍ତିନୀ

ହ
ହାନାଦାର
ହୁଙ୍କାର
ହଜ

ହିଜରି

- ରାଜକୀୟ ।
- ରକ୍ତ ଦିଯେ ଶାଲ କରା ହେବେ ଯା ।
- ପ୍ରହରୀ, ସେନା ।
- ରାଜପୁରି ବା ରାଜବାଡ଼ି ।
- ଉତ୍ତରପ ।
- ହୟରାନ ।
- ମନେର ଇଚ୍ଛା, ଝୁଟି ।
- ଶଖ କରେ ପଦମେ ଜିନିସ ଏହି ସୁନ୍ଦର ହାଡ଼ିତେ ରାଖା ହୁଯ, ତାଇ ଏର ନାମ ଶତ୍ରୁହାର ହାଡ଼ି ।
- ଶକ୍ତି ଆହେ ଯାଇ ।
- ଶୀତ ।
- ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋଲାହଳେ ଶଦ୍ଦୂସଣ ଘଟେ ।
- କୁମିଳାର ମଯନାମତିତେ ମାଟି ଧୁଢ଼େ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ । ଅଟ୍ଟାଦଶ ଶତବୀରେ ଏହି ପୁରାକୀର୍ତ୍ତ ବାଙ୍ଗାଦେଶେର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚାଯକ । ଶାଳବନ ବିହାରେଓ ପାଉୟା ଗେଛେ ନାନା ଧରନେର ପୋଡ଼ାମାଟିର ଫଳକ ।
- ବାଦଶାହ, ରାଜାଧିରାଜ ।
- ବାଦଶାହ ପୁତ୍ର ।
- ଶୁଯେ ଆହେ ଏମନ ।
- ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ।
- ମାଥା ।
- ଯିନି କୋନୋ ଶିଳ୍ପକଳାର ଚର୍ଚା କରେନ ତିନିଇ ଶିର୍ଲୀ । ଯେମନ- ସଜୀତଶିର୍ଲୀ, ଚିତ୍ରଶିର୍ଲୀ ।

- ପ୍ରତିଜ୍ଞା ।
- ଦେଶ ଚାଲାଯ ଯେ ।
- ଯେ ଜୟି ଉଚ୍ଚନ୍ତି ନଯ, ପାହାଡ଼ି ନଯ, ତାକେଇ ସମତଳ ଭୂମି ବଲେ ।
- ଏକସଙ୍ଗେ ଶବ୍ଦ କରା ବା କଥା ବଳା ।
- ଜନସମାବେଶ ।
- ଏକତ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ ।
- ସଫଳ ।
- ରାଖାଇନଦେର ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ।
- ସାଗର ।
- ପୂରାନୋ ପର୍ବତିର ଓଜନ ମାପାର ଏକକ (୧ ସେର = ପ୍ରାୟ ୦.୯୩୫ କେଞ୍ଜି) ।
- ଆଦର
- ଖେତେ ଭାଲୋ ଲାଗେ ଏମନ ।
- ନିଜେର ଲୋକ, ଆତୀୟ, ବନ୍ଦୁବାନ୍ଧବ ।
- ସୋନାଲି ରଙ୍ଗେର ବୁନୋ ଲତା । ଅନେକ ସମୟ ପଦେର ଧାରେର ଗାହଗାହଳି ଭରେ ପାକେ । ଏହି ଲତା ଆପନା-ଆପନି ଜନ୍ମାଯ ।
- ଭାଲୋ ଭାଗ୍ୟ ।
- ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିସ ।
- ନଦୀ ।

- ଆକ୍ରମଣକାରୀ ।
- ଚିତ୍କାର ।
- ହିଙ୍ଗରି ଜିଲ୍ଲାହଜ ଯାସେର ୯ ତାରିଖେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଇହରାମ ବେଁଧେ ମକାର ଅଦୂରବତୀ ଆରାଫାତ ମୟାଦାନେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ପରେ କାବାର ତତ୍ତ୍ଵାବ୍ଦୀ ସଂବଲିତ ଇସଲାମି ଅନୁଷ୍ଠାନ ।
- ଯଶୁତ୍ରିତେର ଜନ୍ମେର ୬୨୨ ବହୁ ପରେ ହୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ)-ଏର ମକା ତ୍ୟାଗ କରେ ମଦିଲାଯ ଗମନେର (ହିଜରତେର) ଦିନ ଥେବେ ଗଣିତ ଚାନ୍ଦ୍ର ଅଳ୍ପ ବା ବହୁ ।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫ - বাংলা



শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

পরনিন্দা ভালো নয়



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য